শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক
সাহেব দামাত বারাকতুহুম- এর
পছন্দনীয়

গল্পের তোহফা

মাওলানা ইরফান জিয়া

Install “Islami Jindegi” App
www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক
দামাত বারাকাতুহুম -এর পছন্দনীয়

গল্পের তোহফা

মুহাম্মাদ ইরফান জিয়া

মাকতাবাতুল মানসুর
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

মুহাম্মাদ ইরফান জিয়া
গল্পের তোহফা
গ্রন্থস্বত্ব লেখকের

প্রচ্ছদ: কাজী যুবাইর মাহমুদ
অঙ্গসজ্জা: মাওলানা মাহমূদুল হাসান
প্রকাশনা: মাকতাবাতুল মানসুর
প্রথম প্রকাশ: মুহাররম ১৪৪১হি. সেপ্টেম্বর ২০১৯ঈ.

নির্ধারিত মূল্য ১০০ (একশত) টাকা

Golper Tohfa
Written By: Muhammad Erfan Zia,
Published By: Maktabatul Mansoor, Jamia Rahmania Arabia, Ali & Noor Real Estate, Muhammadpoor, Dhaka-1207, Bangladesh.
ISBN: 978-984-34-7214-4
Fixed Price: Tk. 100.00, Us $: 5.00.

islamijindegi@gmail.com • darsemansoor.com@gmail.com

প্রথম কথা

মুফতী মনসূরুল হক দামাত বারাকাতুহুম

হামদ ও সালাতের পর...

সাধারণ ধারণায় গল্প ও কেচ্ছা-কাহিনী নিছক অবসর কাটানো ও হালকা বিনোদন-সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত। সাধারণ গল্প-কাহিনীগুলো যারা গড়েন ও পড়েন এই দৃষ্টিকোণ থেকেই গড়ে-পড়ে থাকেন। ইতিহাস ও সত্যাশ্রয়ী গল্প-কাহিনীগুলো কিন্তু তেমন নয়। এর কিছু তো সূত্রসমৃদ্ধ নিখাঁদ সত্য আর কিছু সূত্রহীন হলেও পরম বাস্তব। কঠিন বিষয়কে সহজ ও স্মরণীয় করতে এবং সুকঠিন সত্যকে গ্রহণযোগ্য ও বরণীয় করতে এসব গল্পের জুড়ি নেই। অনেক সময় ঘণ্টা-দু'ঘণ্টার জ্ঞানগর্ভ আলোচনাও পাঁচ মিনিটের গল্পে হৃদয়ঙ্গম করানো যায়। গল্প তখন গল্প থাকে না; হয়ে ওঠে মস্তবড় হাতিয়ার।

গল্প-কাহিনীর প্রতি মানুষের স্বভাবজাত ঝোঁক এবং এর বাস্তব উপকার বিবেচনায় নিকট ও দূর অতীতের প্রায় সকল দীনী মুরুব্বী তাদের লেখনী ও বয়ানে গল্পের ব্যবহার করেছেন। কোন কোন মুরুব্বীর তো পছন্দনীয় গল্পের পৃথক সংকলনই বিদ্যমান। মুরুব্বীগণের নগণ্য অনুকারী হওয়ায় আমিও এর বাইরে নই। প্রায় চল্লিশ বছরের শিক্ষকতা ও দীনী খিদমতের সুবাদে ওয়াজ-নসীহত ও দরস-তাদরীসে আলোচ্য বিষয়কে স্পষ্ট ও সকলের নিকট বোধগম্য করার জন্যে প্রচুর গল্প-কাহিনী বলা হয়েছে। এগুলোর বেশিরভাগই বড়দের থেকে শ্রুত কিংবা তাদের কিতাব থেকে আহরিত।

বড়দের মত আমিও কামনা করি, আমার সকল দীনী খিদমত সংরক্ষিত হোক। উদ্দেশ্য, তাঁদের থেকে আহরিত ইলম ও হিকমত এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কালের গর্ভে হারিয়ে না যাক; লিখিতভাবে

সংরক্ষিত হোক। সে কারণে আমার দীর্ঘ দিনের তামান্না ছিলো, আমার বলা শিক্ষণীয় গল্পগুলোও কেউ সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করুক।

প্রিয় শাগরিদ মাওলানা ইরফান জিয়া যে বছর মিশকাত জামা'আতে পড়ে; ওদের দরসে আমি আমার এ তামান্নার কথা ব্যক্ত করেছিলাম। আল্লাহর শোকর বিষয়টি সে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বয়ান ও দরসে বলা গল্পগুলো ওর ভাষায় বিন্যস্ত করেছে। আমার লেখা কিতাবাদি এবং বিগত সময়ের ছাত্রদের থেকেও বেশ কিছু সংগ্রহ করেছে। তারপর কম্পোজ করে, সূত্র উদ্ধৃত করে আমার কাছে পেশ করেছে। বইটির অনেকস্থানে আমি দেখেছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিয়েছি।

দীনী কথামালার সহজ-সরল উপস্থাপনাই আমার পছন্দ। এক্ষেত্রে ভাষা-সাহিত্যের অনর্থক বাগাড়ম্বর আমার মতে উপকারী নয়। সে হিসেবে গল্পগুলোর উপস্থাপনা ভাল লেগেছে। প্রাথমিক কাজ হিসেবে গল্পের পরিমাণও সন্তোষজনক। আমার পুরনো ছাত্রদের থেকে আরো ব্যাপকভাবে সংগ্রহের উদ্যোগ নিলে আশা করি বিষয়-বৈচিত্রে ও কলেবরে বইটি আরও সমৃদ্ধ হবে।

জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় ছাত্রদের যে কোন দীনী উদ্যোগ আমাকে যারপরনাই আনন্দিত করে। দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা বইটিকে পাঠকের জন্যে উপকারী করুন এবং মাওলানা ইরফান জিয়াকে ইলম ও আমলে এবং লেখনীর খিদমতে আরও তারাক্কী দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মনসূরুল হক
খলীফা, হযরতওয়ালা শাহ আবরারুল হক রহ.
প্রধান মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
নায়েবে আমীর, মজলিসে দা'ওয়াতুল হক, বাংলাদেশ

দু’ হাজার চৌদ্দ সালের শেষ দিকে। অধ্যয়নের ধারাবাহিকতায় আমরা তখন মিশকাত জামা‘আতে। সেদিন মিশকাত শরীফের দরস চলছিলো। দরস দিচ্ছিলেন উস্তাদে মুহতারাম মুফতী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম।

মুফতী সাহেবের দরসে বসার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে কিংবা সুযোগ হয়েছে তাঁর বয়ান শোনার- তারা খুব ভালোভাবেই হুযুরের কথার আকর্ষণ সম্পর্কে অবগত আছেন। সে আকর্ষণের সামনে অমনোযোগী শ্রোতাকেও হতে হয় একান্ত মনোযোগী। বৈচিত্রময় মেধা মননের অধিকারী প্রতিটি মানুষ খুব সহজেই আত্মস্থ করে নেয় তাঁর আলোচনা। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কুরআন-হাদীসের বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী করতে তিনি নান্দনিকভাবে উপস্থিত করেন উপযোগী সব ঘটনা আর গল্প।

ওদিনের দরসেও হুযুর একটা গল্প বলছিলেন। গল্পটি বলার পর আমাদের হাসির রেশ কাটার আগেই তিনি কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, ‘মাঝে মধ্যেই তো আমি বিভিন্ন হাদীসের ব্যাখ্যায় কত গল্প বলি! তোমরা কি এগুলো নোট করো, নাকি কিছুক্ষণ হেসেই দায়িত্ব শেষ?’ এইটুকু বলে হুযুর সামান্য থামলেন। তারপর বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে একজন প্রস্তুত হও। আমার পছন্দের গল্পগুলোকে একত্র করে একটা সংকলন তৈরি কর।’

সেদিন থেকেই ইচ্ছেটা মনে মনে পুষছিলাম। আল্লাহ তা‘আলার মেহেরবানীতে কাজও শুরু করেছিলাম সাধ্যমতো। মুফতী সাহেব হুযুরের বয়ান, দরস আর লিখিত গ্রন্থাবলী থেকে চলছিলো গল্প সংগ্রহ। গল্পগুলোর মূল ভাবকে অক্ষুণ্য রেখেই সেগুলোকে নিজের ভাষায় চিত্রায়িত করছিলাম। সেই সাথে চালাচ্ছিলাম গল্পগুলোর মৌলিক সূত্রের অনুসন্ধান।

রাব্বে কারীমের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া! আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস এবং কিছু সুহৃদ ও শ্রদ্ধেয়জনের একান্ত সহযোগিতায় হুযুরের পছন্দের অনেক গল্প ইতোমধ্যে জমা হয়ে গেছে। সেসব গল্প থেকে বাছাইকৃত কিছু গল্প নিয়েই আপনাদের হাতে এই ‘গল্পের তোহফা’।

ইরফান জিয়া
দারুত তাসনীফ, মা’হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া
বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১লা মুহাররম, ১৪৪১ হিজরী
১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ঈসায়ী

অর্পণ
মুহাম্মাদ মু‘আজ বিন জিয়া
আট বছর বয়স থেকেই যে
‘গল্পের তোহফা’
হাতে পাওয়ার জন্যে
উদগ্রীব হয়ে আছে...

সূচী

সীরাত থেকে নেয়া		সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দাও
অবশেষে মানতে হলো		নবীজীর ফায়সালায় নারাজ
লাজুকতার নিরেট চাদর		স্বার্থহীন শত্রুতা
বিশ্বাসের তরবারী		শেষ নবীর খোঁজে
নবীজীর মা		গল্প তবে কল্প নয়
ক্ষমা করো হযরত		ঈমানের অনুভূতি
কা'বার চাবি		ইস্ মে ভী খায়ের হ্যায়
মল্লযুদ্ধে নবীজী		রাজ্য ও রাজকন্যা
সাহাবায়ে কিরামের গল্প		দাম্পত্য চিকিৎসা
আশা নিরাশার দোলাচল		মনের বাঘ
নবীপ্রেমের উচ্চাসন		দড়ি সমাচার
প্রয়োজনটা বড় নয়		মেধাবল বনাম বাহুবল
তখনও ভোলেননি		জ্ঞানী ও ধনী
বিচ্ছু, কিচ্ছু না		পানপাতার রাখাল
তলওয়ারে নয়		জাহেলে মুরাক্কাব
কর্মফল		গজাল কাহিনী
বিচ্ছু রেখে হাতে		বিশ্বজোড়া পাঠশালা
ছাত্র মানেই প্রশ্ন		সহজ সংশোধন
সংক্ষেপে আফসোস		বড়র হাতে হাত
অর্ধেক রাজ্যের বিনিময়ে		সঙ্গ গুণ
চোরের যুক্তি		রঙ ধরবার জন্যে
অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর		শেখার আছে অনেক কিছু
বখীলের যোগ্য ছেলে		বেঁচে থাকা ইতিহাস
বড়দের দীপ্ত জীবন		ত্যাগ মহিয়ান
এই হলো নিয়ত		কপালপোড়া

বাচ্চা পাওনাদার		কাবেল ও মাকবুল
বুযুর্গীর রহস্য		খোদার রহম বাহানা খোঁজে
সবকিছু কেনা যায় না		সবার জন্যে পাগড়ি
ইংরেজ ও ইংরেজি		খোরাসানের উট
অভাব যখন ধৈর্যের		সমুদ্র হৃদয়
খিচুড়ি প্রসঙ্গ		বিনয়ের বৃষ্টি

সীরাত থেকে নেয়া

অবশেষে মানতে হলো

ছেলেটা ছিলো ইয়াহুদী। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম। বেশ কিছুদিন ধরেই সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করছিলো।

একদিন হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। রোগীর শুশ্রূষায় উপস্থিত হওয়া নবীজীর অনুপম আদর্শ। হোক সে ইয়াহুদী বা খৃস্টান। সেই অসুস্থ বালকের খোঁজ খবর নিতে রওয়ানা হলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাথে কয়েকজন সাহাবী।

সেখানে পৌঁছে নবীজী দেখলেন, ছেলেটির পিতা তার মাথার সামনে দাঁড়ানো। তাওরাত পাঠ করছে।

নবীজী সুস্পষ্টভাবে জানতেন, তাঁর বর্ণনা তাওরাত ইঞ্জিলে আছে। তিনি ইয়াহুদীকে তাওরাত পাঠরত পেয়ে তাকে দিয়ে কথাটা স্বীকার করাতে চাইলেন।

ইয়াহুদীরা হযরত মূসা আ. কে নবী মানার দাবি করে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীকে মূসা আ. -এর রবের কসম দিলেন। বললেন, ‘হযরত মূসা আ. এর ওপর তাওরাত নাযিলকারী রবের শপথ, সত্যি করে বলোতো, আমার কথা কি তাওরাতে নেই? আমার আবির্ভাবের বর্ণনা কি তোমরা সেখানে পাও না?

কিন্তু না, মূসা আ. -এর রবের কসমও সে ইয়াহুদীর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো না। সে পরিস্কার অস্বীকার করে বসলো। বাবার এই মিথ্যাচার দেখে ছেলে স্থির থাকতে পারলো না। সে বলে

উঠলো, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার গুণাবলীর কথা, আপনার আবির্ভাবের কথা সবই আমরা তাওরাতে পেয়েছি।

সহজ সরল এ স্বীকারোক্তির পর ছেলেটির হেদায়াতের দরজা খুলে গেলো। কেটে গেলো জমে থাকা মেঘের আঁধার। উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলো, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আন্নাকা রাসূলুল্লাহ।

গল্পের তোহফা:

সত্যের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। সত্যই মানুষকে হেদায়াতের পথ দেখায়। সত্যের আলো ফুটলে মিথ্যার আলো পালাতে বাধ্য হয়।

লাজুকতার নিরেট চাদর

পবিত্র কা'বা ঘর। মুসলিম উম্মাহর প্রাণকেন্দ্র। মর্যাদা ও অভিজাত্যের প্রতীক। ইসলামপূর্ব যুগেও একে সম্মান ও গৌরবের মাধ্যম মনে করতো কুরাইশ গোত্র। এ ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের কাজকে তারা নিজেদের দায়িত্ব মনে করতো। নিজেদের কল্পিত পদ্ধতিতে হলেও তারা খানায়ে কা'বার সম্মান করতো।

একদিন এক মহিলা কা'বার চার পাশে ধূনি দিচ্ছিলো। হঠাৎ আগুনের একটা ফুলকি উড়ে গিয়ে লাগলো কা'বার গেলাফে। আগুন লেগে পুড়ে গেলো কা'বা ঘর। কুরাইশ গোত্র কা'বা ঘর সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিলো। লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কাজে অংশগ্রহণ করলো।

কাজের সুবিধার জন্যে সবাই ভেতরের স্বল্প বসন রেখে পরনের অতিরিক্ত কাপড় খুলে কাঁধে রেখে দিয়েছিলো। তারপর সে কাপড়ের ওপর বহন করছিলো পাথর। এতে সবাই পুরোপুরি বিবস্ত্র না হলেও হাটুর উপরিভাগ অর্থাৎ শরীরের সতরের কিছু অংশ নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছিলো।

নবীজী তখন খুবই ছোট। একেবারে বালক। তিনিও সেখানে উপস্থিত হয়ে পাথর বহন করতে লাগলেন। তবে অন্যদের মতো তাঁর কাধে কোন অতিরিক্ত কোন কাপড় ছিলো না। একেতো কচি কাঁধ। তার ওপর খালি কাঁধে পাথর বহন করায় নবীজীর খুব কষ্ট হচ্ছিলো।

নবীজীর চাচা আব্বাসও উপস্থিত ছিলেন একাজে। ভাতিজার কষ্ট দেখে তার মায়া হলো। তিনি বললেন, তুমিও কাপড়টা খুলে কাঁধে দিয়ে নাও, আরাম পাবে।

চাচা আব্বাস নবীজীর ওপর দয়াদ্র হয়ে তাঁর অতিরিক্ত কাপড় খুলে ঘাড়ের ওপর রাখতে গেলেন। ভেতরের স্বল্প বসন নিশ্চয় ছিলো। তবু এতটুকু অনাবৃত হতেই নবীজী বেহুশ হয়ে জমিনে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তার জ্ঞান ফিরে এলো। জ্ঞান ফেরার পরই তিনি বলতে লাগলেন, আমার কাপড়! আমার কাপড়!

নবীজীকে কাপড় পরিয়ে দেয়া হলো। এরপর থেকে কোনোদিন তার সতর সামান্যতম খোলাও দেখেনি কেউ।

গল্পের তোহফা:

পৃথিবীর সব ভালোগুণের মূর্তপ্রতিক ছিলেন নবীজী। লাজুকতার গুণেও তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ। এই গুণেও কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারবে না।

বিশ্বাসের তরবারী

বদর যুদ্ধের দিন। মুশরিক বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। বীরের মতো লড়াই করছেন হযরত উক্কাশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। কচুকাটা করে চলছেন কাফেরদের।

হঠাৎ তার তরবারীটা ভেঙ্গে পড়লো। তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন। চারদিকে শত্রুবাহিনী। কী উপায় হবে?

অবস্থা লক্ষ করে নবীজী তার দিকে একটি ডাল ছুড়ে দিলেন। বললেন, 'উক্কাশা, এটা দিয়ে লড়াই চালাও।

অবিশ্বাসী কেউ এ দৃশ্য দেখলে হয়তো হাসবে। বোকা ঠাওরাবে নবীজীকে। কিন্তু উক্কাশা তো ছিলেন একজন দৃঢ়বিশ্বাসী মুমিন। তিনি নবীজীর দেয়া ডালকেই আকড়ে ধরলেন। তারপর সেটাকে চালনা করলেন কাফেরদের ওপর।

ঠিক সে সময়েই ডালটি পরিণত হলো তরবারীতে। বিজয় অর্জন হওয়া পর্যন্ত তিনি সেটি দিয়েই যুদ্ধ করলেন।

তরবারীটি ছিলো খুবই চমৎকার। লম্বা, ধারালো, চকচকে ও মজবুত। হযরত উক্কাশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সবসময় সেটিকে সাথেই রাখতেন। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর যামানায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

গল্পের তোহফা:

সাহাবায়ে কেরাম নবীজীর প্রতিটি আচরণ-উচ্চারণকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। পুরো পৃথিবীর কাছে যে বিষয়টা অবিশ্বাস্য; নবীজীর কাছ থেকে সেটাকেই তাঁরা পরম নিশ্চিন্তে মেনে নিতেন। দুনিয়া-আখেরাতের সকল বিষয়ে এ বিশ্বাসের ফলও তারা পেয়েছেন ।

নবীজীর মা

আব্দুল মুত্তালিবের পুত্রবধূ আমিনা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় মা। খুব বেশি দিন তাঁর স্নেহ পাওয়ার সুযোগ হয়নি নবীজীর। কারণ, জন্মের কিছুদিন পরেই তাকে হালিমা সা'দিয়ার ঘরে যেতে হয়েছে।

হালিমা সা'দিয়া ছিলেন হাওয়াযিন গোত্রের। নবীজীর দুধ মা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে তিনি অত্যন্ত স্নেহের সাথে লাগাতার দু'বছর নবীজীকে প্রতিপালন করলেন।

দু'বছর পেরিয়ে গেলো। হালিমা নবীজীকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে মক্কায় গেলেন। মক্কায় তখন মহামারী চলছে। মা আমিনা হালিমাকে অনুরোধ করলেন, আরো কিছুদিন নবীজীকে তার কাছে রাখতে।

হালিমা নবীকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। আরো চার বছর তার কাছেই থাকলেন নবীজী। এরপর তার বয়স যখন ছয় হলো, মা আমিনার কোলে ফিরে এলেন।

কিন্তু ততদিনে মা আমিনার জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। নবীজী তার কাছে আসার কিছুদিন পরই তিনি তাকে নিয়ে মদীনায় গেলেন। উদ্দেশ্য, স্বামী আব্দুল্লাহর কবর যিয়ারত এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাত। ফেরার পথে আবওয়া নামক গ্রামে মা আমিনার ইন্তেকাল হয়ে গেলো। চিরদিনের জন্যে মায়ের আদর হারালেন নবীজী।

মা আমিনার সাথে নবীজীর স্মৃতি খুবই স্বল্প। তবু এই টুকরা স্মৃতিগুচ্ছই তাকে তাড়া করে ফিরতো। মাঝে মাঝেই তিনি সেসব স্মৃতি আবেগের সাথে স্মরণ করতেন। মা আমিনা চলে যাওয়ার পর নবীজীর মা বলতে রইলেন হালিমা সা'দিয়া।

তুফাইল রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু বর্ণনা করেন, ‘আমি তখন ছোট। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার গোশত বণ্টন করছিলেন। জায়গাটার নাম ছিলো জিইররানা। হঠাৎ দেখলাম, একজন বৃদ্ধা মহিলা দূর থেকে আসছেন। তিনি নবীজীর কাছেই এলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মহিলার বসার জন্যে নিজের গায়ের চাদর খুলে বিছিয়ে দিলেন। আশ্চর্য হলাম। নবীজী নিজের পরনের চাদর বিছিয়ে দিলেন! কে এই মহিলা?

অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের কাছে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, তিনি আর কেউ নন। নবীজীর দুধ মা হালিমা সা’দিয়া।

গল্পের তোহফা:

শ্রদ্ধা ও সম্মানের কী সুন্দর প্রকাশ। আপন মা তো মাথার তাজ। দুধ মা’র জন্যেও কতটা শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন নবীজী।

ক্ষমা করো হযরত

নবুওয়াতের এগারতম বছর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালেব এবং স্ত্রী খাদিজা উভয়ে ইন্তেকাল করেছেন। স্বজন হারানোর এই প্রচণ্ড বেদনা উপেক্ষা করেই দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

কিন্তু কাফেরদের অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে মক্কায় অবস্থান করা দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে। তিনি ভাবছেন, কিছুদিনের জন্যে হলেও দাওয়াতের ক্ষেত্র পরিবর্তন করা দরকার।

এই ভাবনা থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে যাবেন বলে ঠিক করলেন। মক্কা থেকে একশ' তের কিলোমিটার দূরে তায়েফ। স্বীয় পালকপুত্র যায়েদ ইবনে হারেসকে নিয়ে রওয়ানা হলেন তায়েফের পথে।

তায়েফে সম্ভ্রান্ত বংশ হিসেবে পরিচিত ছিলো 'বনু সাকীফ'। আবদে ইয়ালীল, মাসউদ ও হাবীব তিন ভাই ছিলো এই বংশের কর্ণধার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা করলেন, নেতৃত্বের আসনধারীরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে; অন্যরা এমনিতেই চলে আসবে। নবীজী তাই বনু সাকীফ গোত্রের এই তিন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলেন।

ইসলামের দাওয়াত পেয়ে তাদের ব্যবহার বিগড়ে গেলো। একজন বললো, 'আল্লাহ যদি তোমাকে নবী বানিয়েই থাকেন তবে কা'বার গেলাফ (মর্যাদা) ছিন্ন হতে চলেছে।'

অন্য ভাই বললো, 'আল্লাহ কি নবী বানানোর জন্যে আর কাউকে খুঁজে পেলেন না। নবী কি পায়ে হেঁটে আসে। কোনো ধনী লোক অথবা সরদারকে নবী বানানো উচিত ছিলো।'

আরেক ভাই বললো, ‘আমি তোমার সাথে কোনো কথাই বলব না।’

নবীজী বললেন, ঠিক আছে। তোমরা আমার কথা মানো বা না মানো, কাউকে ইসলাম কবুল করতে বাধা দিও না। আমি চেষ্টা করে দেখি, কাউকে বোঝাতে পারি কিনা।

নবীজী আবার পথে নামলেন। তায়েফবাসীদের হেদায়াতের জন্যে ঘুরতে লাগলেন। কিন্ত তায়েফের সরদাররা বড় নীচুতার পরিচয় দিলো। দুষ্ট ছেলে আর বখাটের দলকে লেলিয়ে দিলো নবীজীর পেছনে।

নবীজী হাঁটছেন। পেছনে ছুটছে দুষ্টের দল। চলছে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ আর গালাগাল। সেই সাথে চলছে ইট পাথর নিক্ষেপ। নবীজীকে পাগল বলছে তারা। পাথরের আঘাতে হুযুরের দেহ রক্তাক্ত। ক্লান্ত শ্রান্ত। রক্তে জুতা আটকে গেছে পায়ের সাথে। কোথাও একটু বসার সুযোগও পাচ্ছেন না তিনি। বসতে চাইলেই হৈচৈ করে উঠিয়ে দিচ্ছে।

যায়েদ ইবনে হারেস অনেক চেষ্টা করেও নবীজীকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারলেন না। তিনি নিজেও মারাত্মক আহত হলেন। অবশেষে অনেক কষ্টে তায়েফ থেকে বেরিয়ে এলেন।

তায়েফ থেকে তিন মাইল দূরে একটি আঙ্গুরের বাগান। নবীজী আর যায়েদ বাগানের ছায়ায় বসে পড়লেন। একটু বিশ্রাম না নিলে পা আর চলছে না। বাগানের মালিক দুই ভাই। উতবা আর শাইবা। উভয়েই অমুসলিম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর দেখে তাদের দয়া হলো। গোলামকে আদেশ করলো, এদেরকে ঝুড়ি ভরে আঙ্গুর দাও।

গোলামের নাম ছিলো আদ্দাস। সে আঙ্গুর এনে দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহ বলে আঙ্গুর মুখে দিলেন। নবীজীর মুখে বিসমিল্লাহ শুনে আদ্দাস অবাক হয়ে গেলো। বললো, এ বাক্য তো এখানকার লোকেরা বলে না!

নবীজী তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কোন এলাকার? তোমার ধর্ম কী?'

সে বললো, 'আমি খৃস্টান। নিনওয়ার অধিবাসী।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উত্তর শুনে বললেন, 'তুমি তো নেককার মানুষ ইউনুস ইবনে মাত্তার এলাকার লোক।'

একথা শুনে আদ্দাস আরো বেশি অবাক হয়ে গেলো। বললো, 'আপনি তাকে কীভাবে চেনেন?'

নবীজী বললেন, 'তিনি আমার ভাই। তিনিও নবী ছিলেন। আমিও নবী।'

একথার পর আদ্দাস নবীজীর হাত, পা ও কপালে চুমু খেতে লাগলো।

বাগানে বসেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত উপরে তুললেন। না, তায়েফবাসীর জন্যে কোনো বদ দু'আ করলেন না। বরং নিজের দুর্বলতা ও উপায়হীনতার কথা বলে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেন। দীন প্রচারের জন্যে আল্লাহর কাছে শক্তি কামনা করলেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর পর জিবরাঈল আ. এসে উপস্থিত হলেন। সাথে তায়েফের দু' পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশতা। তারা বললো, হুযুর আপনি অনুমতি দিন।

দুই পাহাড়কে আমরা একত্র করে দিই। নিস্পেষিত করে দিই দুই পাহাড়ের মাঝে অবস্থানকারী তায়েফবাসীকে।

নবীজীর অন্তর কেঁপে উঠলো। আন্দোলিত হলো মমতার সাগর। বললেন, ‘না, না। এমন করার কোনো দরকার নেই। ওরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। কিন্তু হতে পারে ওদের আগামী প্রজন্ম মুসলমান হবে।’

উম্মতের প্রতি এতটাই রহমদিল ছিলেন নবীজী! তাঁর এক বর্ণনা অনুযায়ী দীনের জন্যে সকল নবীর চেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছেন তিনিই।

আরেকবার বলেছেন, ‘আমার জীবনে সবচেয়ে মারাত্মক নির্যাতিত হয়েছি তায়েফে।’

গল্পের তোহফা:

নবীজীর এতোসব কষ্ট স্বীকার ছিলো শুধু দীন প্রচারের জন্যে। দাওয়াত ইলাল্লাহর জন্যে। আমরা কি তাঁর দেখানো পথ আকড়ে ধরতে পেরেছি। এ পথে তাঁর রক্তের ঋণ শোধ করা তো অসম্ভব; কমপক্ষে চেষ্টাও কি করেছি?

কা’বার চাবি

পবিত্র কা’বা ঘর। মুসলিম উম্মাহর প্রাণকেন্দ্র। মর্যাদা ও আভিজাত্যের প্রতীক।

ইসলামপূর্ব যুগেও একে সম্মানের যোগ্য মনে করা হতো। কা’বা ঘরকে কেন্দ্র করে কোনো খেদমতের সুযোগ এলে সেটাকে সৌভাগ্যের কারণ মনে করা হতো। এ কাজে যারা নির্বাচিত হতেন সমাজে তারা পরিচিত হতেন সম্মানিত ও মর্যাদাবান হিসেবে।

এ কারণেই কা’বা ঘরের খেদমতকে ভাগ করে দেয়া হতো বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন মানুষের মাঝে। যেমন, হাজীদেরকে যমযমের পানি পান করাতেন হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু। আরো কিছু দায়িত্ব ছিলো নবীজীর চাচা আবু তালেবের ওপর। এই ধারাবাহিকতায় কা’বা ঘরের চাবির দায়িত্বে ছিলেন হযরত উসমান ইবনে তলহা রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু।

হিজরতের আগের কথা। তখন প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার কা’বা ঘরের দরজা খুলে দেয়া হতো। এ দু’দিন লোকেরা বাইতুল্লায় প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করতো। একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবাকে নিয়ে বাইতুল্লায় প্রবেশ করতে চাইলেন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ালেন হযরত উসমান ইবনে তলহা। তিনি তখনও মুসলমান হননি।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা’বার চাবি না পাওয়াকে অপমান মনে করে ক্ষেপে গেলেন না। নিজ বংশ আভিজাত্য দেখিয়ে জোর করে প্রবেশও করতে চাইলেন না। বরং অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে উসমানের বাধা মেনে নিলেন। বললেন, উসমান, ‘একদিন তুমি এই চাবি আমার হাতে দেখতে পাবে। আমি তখন যাকে ইচ্ছে চাবিটা দেব।’

নবীজীর এই কথার পিঠে উসমান বললেন, ‘এমন দিন যদি আসে তাহলে সেটা হবে কুরাইশ বংশের অপমান ও অপদস্ত হওয়ার দিন।’ নবীজী বললেন, ‘না, না, বরং সেদিন কুরাইশ বংশ হবে যথার্থ সম্মানের অধিকারী। পাবে মুক্তির স্বাদ।’

নবীজীর এই কথা উসমানের হৃদয়ে আশ্চর্যরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। তার বিশ্বাস জন্মে গেলো, মুহাম্মদ যা বলছেন তা অবশ্যই ঘটবে। সেই মুহূর্তেই তিনি ইসলাম গ্রহণের সংকল্প করে ফেললেন।

উসমান ইবনে তলহার এই ইচ্ছের কথা জানতে পারলো তার সম্প্রদায়। সবাই মিলে তাকে ছি ছি করতে লাগলো। তাদের কঠিন ভর্ৎসনায় ইসলাম কবুল করা হলো না উসমানের।

*** *** *** ***

মক্কা বিজয়ের দিন। মক্কার সবকিছুই সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধীন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমানের কাছে কা’বার চাবি চাইলেন। বরকতময় সে চাবি সাথে সাথে তাঁর হাতে তুলে দিলেন উসমান। চাবি নিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে বাইতুল্লাহর দরজা খুললেন। ভেতরে প্রবেশ করে দুই রাক‘আত নামায আদায় করলেন।

বাইরে তখন অপেক্ষমান জনতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হওয়ার পর সবাই সীমাহীন কৌতুহল নিয়ে তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে। কাকে দেয়া হবে আজ কা’বার চাবি। কে পাবে এই মুবারক দায়িত্ব?

হযরত আব্বাস এবং আলী রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। দু’জনই এ চাবি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছিলেন।

এমনকি তারা এ ব্যাপারে আবেদনও করেছিলেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে।

কিন্তু না, সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে নবীজী দরাজ গলায় ডাকলেন উসমান ইবনে তলহাকে। তার হাতেই দিলেন কা'বার চাবি। বললেন, 'এখন থেকে এ চাবি তোমার বংশধরের হাতেই থাকবে। একেবারে কেয়ামত পর্যন্ত। তোমাদের হাত থেকে এ চাবি কেউ নিতে চাইলে সে হবে জালিম, অত্যাচারী।'

উসমান ইবনে তলহা নবীজীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। নবীজী তাকে ডেকে বললেন, 'কী, আমি যা বলেছিলাম তাই হলো না?'

উসমানের মনে পড়ে গেলো হিজরতের আগের ঘটনা। মনে পড়ে গেলো নবীজীর সে কথা, 'একদিন এ চাবি আমার হাতে দেখতে পাবে'।

এসব ভাবতে ভাবতে বিশ্বাসের আলোয় ভরে উঠলো উসমানের মন। হৃদয়ের গভীর থেকে তিনি বলে উঠলেন, 'আপনার কথা নিঃসন্দেহে বাস্তবায়িত হয়েছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'

গল্পের তোহফা:

ব্যক্তিগত রাগ ধরে না রাখা এবং প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করা ইসলামের মৌলিক নীতির অন্তর্ভুক্ত। এই ঘটনার মধ্যে দুটো নীতিই চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

মল্লযুদ্ধে নবীজী

লোকটার নাম রুকানা। পিতার নাম আবদে ইয়াযীদ। কুরাইশ বংশের পালোওয়ান হিসেবে প্রসিদ্ধ। একদিন মক্কার এক উপত্যকায় তার সাথে নবীজীর দেখা। সে সময় নবীজী পুরো দস্তুর দাওয়াতের কাজ করছেন। দিনে রাতে মানুষকে ডেকে চলছেন ইসলামের দিকে।

রুকানাকে পেয়ে নবীজী বললেন, 'রুকানা! তোমার কি আল্লাহর ভয় নেই, আমার দাওয়াত কবুল করছো না কেন?'

রুকানা উত্তর দিলো, 'আমার যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে তোমার কথাগুলো সত্য, তাহলে অবশ্যই তোমার অনুসরণ করবো।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটা প্রস্তাব দিলেন। বললেন, 'যদি আমি তোমাকে কুস্তিতে হারিয়ে দিই তবে কি আমার কথাকে সত্য মনে করবে?'

রুকানার চোখ কপালে উঠে গেলো। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিনা তাকে কুস্তির আহ্বান করছেন। চরম অবাক হওয়া সত্ত্বেও সে কুস্তিতে সম্মত হলো। শর্ত রইলো, কুস্তিতে পরাজয়বরণকারী বিজেতাকে দেবে একশ' ভেড়া।

রুকানা উঠে দাঁড়ালো কুস্তির জন্যে। চোখের পলকে তাকে ধরাশায়ী করে ফেললেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাকে সম্পূর্ণ পরাভূত করে তার ওপর চেপে বসলেন। রুকানার বিশ্বাস হচ্ছে না। সে আরো একশ' ভেড়ার শর্তে আবার কুস্তির আহ্বান করলো। নবীজী এবারও তাকে ধরাশায়ী করলেন।

রুকানা আশ্চর্যের সাথে বলতে লাগলো, মুহাম্মদ! তুমি আমাকে ফেলে দিচ্ছো!

রুকানা তখনও বিষয়টা ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেনি। সে আরেকবার নবীজীকে আহ্বান করলো। একশ' ভেড়ার শর্ত রইলো এবারও।

তৃতীয়বার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুপোকাত করার পর সে বলতে লাগলো, মুহাম্মদ! আপনার পূর্বে কেউ আমার পিঠ জমিনে ছোঁয়াতে পারেনি।

রুকানার ভাষায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তার কাছে সবচেয়ে অপছন্দের ব্যক্তি। কিন্তু এই ঘটনার পর তিনি হয়ে গেলেন সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। তাই দেরি না করে রুকানা দীক্ষিত হলেন প্রিয় মানুষের ধর্মে। নবীজীও এ নওমুসলিমের সাথে চমৎকার আচরণ করলেন। তার কাছ থেকে পাওনা ভেড়াগুলো দিয়ে দিলেন তাকেই।

গল্পের তোহফা:

শুধু আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে নয়; শারীরিকভাবেও নবীজী ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ। তিনি ছিলেন এ পৃথিবীর সুন্দর ও শুদ্ধতম মহামানব।

সাহাবায়ে কিরামের গল্প

আশা নিরাশার দোলাচল

লোক দেখানোর জন্যে ঈমান এনেছে, অথচ অন্তরে বিশ্বাস নেই, এর নাম হলো মুনাফিক। নবীজীর সময়ে মদীনার বেশ কিছু লোক স্বার্থ হাসিলের জন্যে বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়েছিলো। কিন্তু অন্তরে তারা ছিলো পাকা বেঈমান।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুনাফিককে চিনতেন। কিন্তু তাদের পরিচয় কখনো সাহাবায়ে কেরামের সামনে প্রকাশ করেননি।

তবে একজনকে নবীজী মুনাফিকের পূর্ণ তালিকা জানিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন, হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

মদীনায় কোনো লোক ইন্তেকাল করলে সাহাবায়ে কেরাম লক্ষ করতেন, হযরত হুযাইফা সে জানাযায় অংশগ্রহণ করছেন কি না! তিনি নামাযে শরীক হয়েছেন মানে সে ব্যক্তি মুনাফিকের তালিকায় নেই। আর যদি তিনি শরীক না হয়ে থাকেন, তাহলে মৃতব্যক্তি মুনাফিকের তালিকাভুক্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

একবার হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর কাছে গেলেন। বললেন, হুযাইফা, আল্লাহর দোহাই! বলুন না আমার নাম কি মুনাফিকের তালিকায় আছে?

আশ্চর্য! হযরত উমর নিজের ব্যাপারে মুনাফিক হওয়ার আশঙ্কা করছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন, উমর জান্নাতী।

আর হযরত উমর ভাবছেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই সুসংবাদ প্রদান করেছেন তখন হয়ত আমার আমল ভালো ছিলো। কিন্তু এমনওতো হতে পারে, সুসংবাদের পর কোনো বদআমলের কারণে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছি।

গল্পের তোহফা:

ঈমানদারের কর্তব্য হলো, সবসময় আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকা। আবার তাঁর রহমত থেকে নিরাশও না হওয়া। সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এমনই ছিলো। নিজেদের ব্যাপারে তারা সবসময় আশা নিরাশার দোলাচলে থাকতেন।

নবীপ্রেমের উচ্চাসন

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের কয়েক দিন আগে। তিনি একটি বাহিনী প্রস্তুত করলেন। নেতৃত্বে উসামা বিন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। সৈনিক হিসেবে আছেন আবু বকর উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম -এর মত মহান সাহাবীরা।

বাহিনী প্রস্তুত হলো। ফিলিস্তীনের উদ্দেশে রওয়ানা হবে। কিন্তু তার আগেই ইন্তেকাল হয়ে গেলো নবীজীর। স্থগিত হলো বাহিনীর অভিযাত্রা।

সাহাবায়ে কেরাম ব্যস্ত হলেন রাসূলের কাফন দাফনে। নবীজীর কাফন দাফন শেষ হলো। খলীফাতুল মুসলিমীন আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কাফেলাকে রওয়ানা হতে আদেশ করলেন। আশ্চার্যান্বিত হলেন সাহাবায়ে কেরাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল পরবর্তী সংকটময় মুহূর্ত। এ অবস্থায় কি মদীনাকে খালি করা ঠিক হবে? আপত্তি জানালেন তারা। হযরত উমর রা.ও এ আপত্তির সাথে একমত।

আবু রা. বকর নিজ সিদ্ধান্তে অটল। তিনি অবশ্যই রওয়ানা করবেন কাফেলাকে। তার কথা হলো, 'এই বাহিনী প্রস্তুত করেছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রওয়ানা করাবার ইচ্ছেও তাঁর ছিলো। সুতরাং রাসূলের ইচ্ছে অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এতে কোনো ধরণের প্রতিবন্ধকতা গ্রাহ্য করা হবে না।'

কাফেলা রওয়ানা হলো। ময়দানে শত্রু বাহিনীর সাথে মোকাবিলাও হলো। যুদ্ধ শেষে বিজয়ী বেশে প্রত্যাবর্তন করলো তারা।

আরো কিছু এলাকার কাফেররা রাসূলের ইন্তেকালকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো। এ বাহিনীর তড়িৎ পদক্ষেপ দেখে তারাও ভয় পেয়ে গেলো। ষড়যন্ত্র থেকে নিবৃত হলো ওরা।

গল্পের তোহফা:

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম তামিল করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের এমনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এক্ষেত্রে তারা কোনো প্রতিবন্ধকতা বা আশঙ্কার পরোয়া করতেন না।

প্রয়োজনটা বড় নয়

উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-র একজন লিপিকার দরকার। তাকে এক ইয়াহুদী তরুণের খোঁজ দেয়া হলো। হস্তলিপিতে সে খুবই পারদর্শী। সে তরুণকে একান্ত সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়ার পরামর্শ দিলো কেউ কেউ।

উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাজি হলেন না। বললেন, 'মুসলমানদের বাদ দিয়ে অমুসলিমকে অন্তরঙ্গ বানাতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। আমি কুরআনের এই নিষেধ অমান্য করতে পারব না।

গল্পের তোহফা:

পার্থিব প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও আল্লাহর আদেশের সামনে নিজেকে সম্পূর্ণ সোপর্দ করে দেয়াই হলো খাঁটি ঈমানদারের কাজ।

তখনও ভোলেননি

উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মৃত্যুশয্যায় শায়িত। শরীরের যখম থেকে অঝোর ধারায় রক্ত ঝরছে। এক যুবক তাকে দেখতে এলো। তার লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলছে। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেই মুমূর্ষ অবস্থায় বলে ওঠলেন, এই যুবক! টাখনুর উপরে কাপড় ওঠাও। কারণ, টাখনুর নিচে কাপড় পরতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

গল্পের তোহফা:

মৃত্যুর সময়েও অসৎকাজের নিষেধের এই দৃশ্য! এটা শুধু ফারুকী চেতনা থাকলেই সম্ভব।

বিচ্ছু, কিচ্ছু না

তারা ছিলেন ত্রিশ জন। মরুপথের যাত্রী। আরবের কোন এলাকায় দীন প্রচারের জন্যে যাচ্ছিলেন। পাঠিয়েছেন স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পথে যাত্রা বিরতি হলো। ত্রিশজনের এই কাফেলাটি একটি গ্রামে অবস্থান নিলো। সে সময় আরবের মেহমানদারির খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। কোনো কাফেলা কোথাও উপস্থিত হলে মেহমানদারির কথা বলতে হতো না। মানুষ নিজে থেকেই পরম হৃদ্যতার সাথে কাফেলার মেহমানদারি করতো।

কিন্তু এ গ্রামে আরবের চিরায়ত এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলো। তারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবীদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকৃতি জানালো।

কাফেলার সবাই নিরাশ। খাবারের জন্যে অন্য উপায় বের করতে হবে। ঠিক এমন সময় গ্রামের মানুষ দলবেঁধে উপস্থিত হলো তাদের কাছে। কী ব্যাপার? জানা গেলো, গোত্রের সর্দারকে বিচ্ছু দংশন করেছে। বিষের যন্ত্রণায় সে অস্থির। কিন্তু এর কোনো প্রতিষেধক তারা খুঁজে পাচ্ছে না। নিরুপায় হয়ে সবাই কাফেলার কাছে এসেছে। উদ্দেশ্য, এমন কোনো লোকের সন্ধান করা যে ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে বিষ নামাতে পারে।

এই কাফেলাতে ছিলেন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি ভাবলেন, এই তো সুযোগ। ইচ্ছে করলে আমার সাথীদের জন্যে কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারি। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ আমি ঝাড়ফুঁক জানি। কিন্তু বিনিময়ে আমাকে কিছু দিতে হবে।

গ্রামের লোকেরা আশার আলো দেখতে পেলো। আবু সাঈদ খুদরীর কথায় তারা এক বাক্যে রাজি হয়ে গেল। বললো, আমরা তোমাকে ত্রিশটা ছাগল দিবো।

আবূ সাঈদ খুদরী সর্দারের ক্ষতস্থানে ঝাড়ফুঁক করলেন। বর্তমান সময়ে ঝাড়ফুঁক বলতে আমরা যেমন- 'ছু মন্তর ছু' টাইপের ঝাড়ফুঁক বুঝি, তেমন কিছু না। তিনি শুধু সাতবার সূরা ফাতিহা পড়ে তার ওপর দম করলেন। সে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেলো।

শর্ত হিসেবে গোত্রের লোকেরা ত্রিশটি ছাগল পাঠিয়ে দিলো। সেই সাথে পাঠালো অনেক খাদ্য। কাফেলার সবাই ছিলো ক্ষুধার্ত। তৃপ্তির সাথে তারা সে খাবার খেলো। মেহমানদারীর খাবার খেতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ছাগলের ব্যাপারে পরস্পরে মতবিরোধ হয়ে গেলো। কেউ বললো, এগুলো নেয়া যাবে। আর কেউ বললো, না, বিনিময় হিসেবে এগুলো নেয়া যাবে না।

সমাধানের জন্যে সবাই এলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে। তিনি আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিভাবে জানলে, সূরা ফাতিহা বিষ থেকে মুক্তি দেয়? তিনি বললেন, হুযুর! আমার বিশ্বাস ছিলো, আল্লাহর ইচ্ছেয় এর দ্বারা সে আরোগ্য লাভ করবে।

এরপর ছাগলগুলো গ্রহণের প্রসঙ্গ এলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলো তোমরা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এইটুকু বলেই চুপ থাকলেন না। বরং এগুলো যে সম্পূর্ণ বৈধ তা বোঝাবার জন্যে বললেন, 'আমার জন্যেও রেখ'।

গল্পের তোহফা:

কুরআন মানুষের রুহানী চিকিৎসার পাশাপাশি শারীরিক চিকিৎসাও করে থাকে। এ চিকিৎসার কাছে বিচ্ছুও কিচ্ছু না।

তলওয়ারে নয়

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর যুগ। চার দিকে ইসলামের জয়জয়কার। প্রতিদিনই কোনো না কোনো ভূখণ্ড ইসলামী সাম্রাজের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

ধারাবাহিক বিজয়ের পথ ধরে ইসলামী সেনাদল উপস্থিত হলো বাইতুল মাকদিসে। সেখানের ইয়াহুদী-খৃস্টানরা জিযয়া প্রদানে সম্মত হলো। বিনা যুদ্ধে বিজিত হলো জেরুজালেম।

জিযয়া এক ধরনের ট্যাক্স। এর মানে হচ্ছে, মুসলমানরা অমুসলিমদের জান-মাল হিফাজতের দায়িত্ব নেবে। বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর তারা মুসলমানদেরকে প্রদান করবে।

চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেলো। ইসলামী খেলাফতের পক্ষ থেকে তাদের নিরাপত্তার জন্যে সৈন্য মোতায়েন করা হলো। তারাও প্রতি বছর 'জিযয়া' দিতে থাকলো।

কিছুদিন পরের কথা। আরেকটি যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের সৈন্য সংকট দেখা দিলো। কেউ কেউ পরামর্শ দিলো, বাইতুল মাকদিসে অনেক সৈন্য আছে। তাদেরকে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে না। সুতরাং তাদেরকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেয়া হোক।

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, এটা করা যেতে পারে। তবে তার আগে আরেকটি কাজ করতে হবে। জেরুজালেমের বাসিন্দাদের একত্র করে বলতে হবে, তোমাদের সুরক্ষার দায়িত্বপালনের জন্যে আমরা সৈন্য মোতায়েন করেছিলাম। কিন্তু সৈন্য সংকটের কারণে তাদেরকে সরিয়ে ফেলতে হচ্ছে। এখন আমরা যেহেতু আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছি না সে জন্যে এ বছর তোমরা যে কর প্রদান করেছ, তা ফিরিয়ে দিচ্ছি।

গল্পের তোহফা:

এই হচ্ছে ইসলাম। এই হচ্ছে মুসলমানদের রাজনীতি। যে নীতি সবাইকে স্বমহিমায় আকৃষ্ট করে, টেনে নিয়ে যায় সত্যের পানে।

কর্মফল

উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন খলীফাতুল মুসলিমীন। তার আদালতে এক লোক ফরিয়াদ নিয়ে এলো। নিজের ছেলের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ। ছেলে তার ওপর জুলুম করে।

খলীফা ছেলেকে তলব করলেন। তার কাছে এ আচরণের কৈফিয়ত চাইলেন। ছেলে কৈফিয়ত না দিয়ে বললো, আমীরুল মুমিনীন, শুধু কি সন্তানের ওপরই পিতার সব পাওনা আর অধিকার? পিতার কাছে কি সন্তানের কোনোই পাওনা নেই?

উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। সন্তানের জন্যেও রয়েছে পিতার কিছু কর্তব্য।

'সন্তান যেন আল্লাহওয়ালা হয় সেজন্যে পিতা সর্বপ্রথম কোনো দীনদার মহিলাকে বিয়ে করবে।

এরপর সন্তান জন্ম নিলে সুন্দর ও ভালো দেখে নাম রাখবে। কারণ মানুষের নাম তার চরিত্রের মধ্যে প্রভাব ফেলে।

এরপর পড়ালেখার বয়স হলে সন্তানকে দীনী তা'লীম দিবে।

প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে গেলে তাকে দীনদার পাত্র-পাত্রীর সাথে বিয়ে দিয়ে দিবে।'

সন্তানের জন্যে পিতার এসব কর্তব্যের কথা শুনে সে যুবক বলতে লাগলো, আমীরুল মুমিনীন, আমার পিতা তো এসব দায়িত্বের একটাও পালন করেননি।

'তিনি বিয়ে করার সময় দীনদারীর খোঁজখবর না নিয়ে কেবল সৌন্দর্য দেখে এক মহিলাকে বিয়ে করেছেন। সে মহিলা চরিত্রহীনা ও বেপর্দা।

জন্ম নেয়ার পর আমার এমন নাম রেখেছেন যেটার অর্থ হলো, নর্দমার কীট।

শেখার বয়স হওয়ার পর আমাকে কোনো রকম দীনী তা'লীম না দিয়ে কাজকর্মে লাগিয়ে দিয়েছেন।'

ছেলের এ বক্তব্য হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যাচাই করলেন। দেখলেন, সে ঠিকই বলছে। তিনি ছেলের পিতাকে বললেন, আসল জালিম তো তুমি। তুমিই আগে ছেলের ওপর জুলুম করেছো। সে জুলুমের ফল এখন তোমাকেই ভোগ করতে হবে।

গল্পের তোহফা:

সন্তানাদি এক দিকে আল্লাহ তা'আলার বিরাট নেয়ামত। অন্যদিকে বিশাল পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে সন্তানকে খুবই সতর্কতার সাথে তারবিয়াত করতে হয়।

সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দাও

সেকালের পরাশক্তি রোম। মুসলমানদের সঙ্গে চলছিলো তাদের ধারাবাহিক সংঘাত। হযরত মু'আবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন সিরিয়ায়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে যুদ্ধ বন্ধের সন্ধি করলেন। এ সময়ের মধ্যে কেউ কারো ওপর আক্রমণ করবে না।

সময় এগিয়ে চললো। সন্ধির মেয়াদ শেষ হয়ে এলো। মু'আবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। মেয়াদ শেষ হবার আগেই তিনি সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করলেন। তবে হামলা না করে অপেক্ষায় রইলেন।

মেয়াদের শেষ তারিখ। সূর্য সবেমাত্র অস্ত গেছে। হযরত মু'আবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেনাদলকে অভিযানের হুকুম দিলেন।

শত্রু পক্ষ ছিলো সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। তারা ভেবেছিলো, মেয়াদ শেষ হবার পর মুসলমানরা প্রস্তুতি নেবে। তারপর হবে হামলা। কিন্তু মুসলমানদের এই আচমকা হামলায় তারা দিশেহারা হয়ে গেলো। তাদেরকে অপ্রস্তুত রেখে হযরত মু'আবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এগিয়ে চললেন। শহরের পর শহর, দেশের পর দেশ তার পদতলে আসতে লাগলো।

এই অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার মধ্যেই হঠাৎ দেখা গেলো এক অশ্বারোহী চিৎকার করতে করতে পেছন থেকে এগিয়ে আসছে। মু'আবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেমে গেলেন। ভাবলেন, অশ্বারোহী আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে কোনো পয়গাম নিয়ে এসেছে।

অশ্বারোহী কাছাকাছি চলে এলো। উচ্চস্বরে বলতে লাগলো, ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহর বান্দারা থেমে যাও!’

আরো কাছাকাছি আসার পর সে অশ্বারোহীকে চেনা গেলো। হযরত আমর ইবনুল আবাসা রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু। হযরত মু‘আবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কী?

তিনি বললেন, মুমিনের নীতি হলো, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা মুমিনের নীতি নয়।

মু‘আবিয়া বললেন, আমিতো চুক্তি ভঙ্গ করিনি। মেয়াদ শেষ হবার পরই তো আক্রমণ করেছি।

আমর ইবনুল আবাসা রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু বললেন, আপনি মেয়াদের ভেতরে সীমান্ত এলাকায় সেনা সমাবেশ করেছেন। এটা চুক্তিবিরোধী কাজ। আমি নিজ কানে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সাথে যদি কোনো জাতি সন্ধি করে তাহলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া ছাড়া অথবা তাদেরকে স্পষ্টভাবে জানানো ছাড়া সে চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না এমনকি যুদ্ধের জন্যে অগ্রসর হওয়াও যাবে না।

হযরত মু‘আবিয়া রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু কেঁপে উঠলেন। নিজের অনিচ্ছাতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অমান্য হওয়ায় তিনি কুকড়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ ঘোষণা দিলেন, যত এলাকা বিজিত হয়েছে সব ফিরিয়ে দাও।

গল্পের তোহফা:

ইতিহাসের একমাত্র ঘটনা। চুক্তিভঙ্গ থেকে বেঁচে থাকার জন্যে বিজিত এলাকা ফিরিয়ে দেয়া হলো। এটা সম্ভব হয়েছে শুধু একটি কারণে। সাম্রাজ্য বিস্তার তাদের উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর জমিনে দীন কায়েম করা। আল্লাহর হুকুম পালন করতে হয় তারই নির্দেশিত পন্থায়। আল্লাহর হুকুম হচ্ছে, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা। সুতরাং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের সামান্য আভাস পেয়েই পিছু হটলো সেনাপতি। পিছু হটলো সৈন্যরা। ইতিহাসের পাতায় লেখা হল- 'বিজিত এলাকা ফেরৎ দেয়ার নজীর বিহীন দৃষ্টান্ত'।

নবীজীর ফায়সালায় নারাজ

দু'জন লোক। একজন মুসলমান। নাম বিশর। অন্যজন ইয়াহুদী। দু'জনের মধ্যে কোনো এক বিষয়ে ঝগড়া হলো। প্রচণ্ড ঝগড়া। ইয়াহুদী বললো, চলো আমরা ফায়সালার জন্যে নবীজীর কাছে যাই। কিন্তু বিশর বললো, না চলো আমরা ইয়াহুদী নেতা কা'বের কাছে যাই।

আশ্চর্য! ইয়াহুদী চাইছে নবীজীর কাছে যেতে। আর মুসলমান হয়েও সে কিনা চাইছে ইয়াহুদী নেতার কাছে যেতে?

আসলে বিশর ছিলো শুধু নামেই মুসলমান। ভেতরে ভেতরে মুনাফিক। আর এই ঝগড়ার মধ্যে সেই ছিলো অপরাধী। তার জানা ছিলো, তদন্তের পর নবীজী তার বিপক্ষেই রায় দেবেন। এ কারণে সে নবীজীর কাছে না গিয়ে ইয়াহুদী নেতার কাছে যেতে চাইলো।

আর ইয়াহুদী ছিলো সত্যের পক্ষে। তার পূর্ণ আস্থা ছিলো নবীজীর ওপর। সে জানতো নবীজী অবশ্যই ইনসাফপূর্ণ ফায়সালা করবেন। আর ইনসাফের রায় তার পক্ষেই যাবে। বিচারক নির্ধারণ নিয়ে দু'জনের মধ্যে কতক্ষণ বচসা হলো। অবশেষে তারা উভয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক হিসেবে মানতে সম্মত হলো।

মামলা গড়ালো নবীজীর দরবারে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনার তদন্ত করলেন। তারপর ফায়সালা করলেন ইয়াহুদীর পক্ষে। কিন্তু মুনাফিক বিশর ফায়সালা মানতে অস্বীকৃতি জানালো।

সে মনে মনে এক নতুন ফন্দি আটলো। ভাবলো, বিষয়টির ফায়সালা হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে দিয়ে করাতে হবে। তিনি ইয়াহুদীদের প্রতি কঠোর। আর আমাকে বাহ্যিকভাবে

সবাই মুসলমানই মনে করে। সুতরাং উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুসলমান হিসেবে আমার পক্ষেই ফায়সালা করবেন।

সব ভেবে বিশর ইয়াহুদীকে উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর কাছে যাওয়ার প্রস্তাব করলো। ইয়াহুদী রাজী হলো। দু'জন উপস্থিত হলো উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর কাছে।

ইয়াহুদী প্রথমেই হযরত উমরকে বললো, 'প্রিয়নবী ইতোমধ্যে আমাদের ব্যাপারটা জেনেছেন। আমার পক্ষে ফায়সালাও করেছেন। কিন্তু বিশর নবীজীর ফায়সালা মানতে চাইছে না।' উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিশরকে প্রশ্ন করলেন, 'ব্যাপারটা কি আসলেই এমন?' বিশর বললো, 'হ্যাঁ'।

উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, দাঁড়াও আমি একটু ঘর থেকে আসছি। তিনি একটি তরবারী নিয়ে ঘর থেকে বেরুলেন। এক আঘাতে হত্যা করে ফেললেন মুনাফিককে। তারপর বললেন, 'প্রিয় নবীর ফায়সালায় যে সন্তুষ্ট হয় না তার উপযুক্ত শাস্তি এটাই।'

স্বার্থহীন শত্রুতা

দু'জনের মধ্যে লড়াই চলছে। প্রচণ্ড লড়াই। একদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। অন্যদিকে এক ইয়াহুদী।

অনেক্ষণ লড়াই চললো। এক পর্যায়ে আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সে ইয়াহুদীকে কুপোকাত করে ফেললেন। চড়ে বসলেন তার বুকের ওপর। ইয়াহুদী সম্পূর্ণ পরাভূত। তালওয়ারের এক আঘাতেই আলাদা হয়ে যাবে তার মাথা। কিন্তু শক্তিতে না পেরেও নিরস্ত হলো না ইয়াহুদী। থুথু মেরে বসলো আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর মুখে।

থুথু মেরে সে ইয়াহুদী মনে মনে ভাবলো সময় আর বেশি নেই। এখুনি সে মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে। থুথু না দিলে হয়তো বেঁচে থাকার আশা সামান্য হলেও করা যেতো। এখনতো আর কোন আশাই বাকি থাকলো না।

কিন্তু তার সব ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার বুক থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ছেড়ে দিলেন তাকে। ইয়াহুদী বিস্ময়ে থ হয়ে গেলো। শত্রুকে মুঠোয় পেয়েও কেউ এভাবে ছেড়ে দেয়? এর কারণ কী হতে পারে? বিস্ময় ধরে রাখতে না পেরে সে আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে জিজ্ঞেস করে বসলো।

আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তোমার সাথে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। কোনো স্বার্থ বা ব্যক্তিগত ক্রোধ এতে জড়িত ছিলো না। কিন্তু তুমি থুথু দেয়ার পর আমার মনে সামান্য হলেও ক্রোধ সৃষ্টি হয়েছে। এই তো- আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে মিশে গেলো আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ। এ স্বার্থ নিয়ে তোমাকে

হত্যা করলে সেটা হবে নিষ্ফল কাজ। কোনো সওয়াব পাবো না আমি। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টির সামনে ব্যক্তিগত স্বার্থকে কুরবানী করে তোমাকে ছেড়ে দিলাম।

ইয়াহুদী এই প্রথম দেখলো এমন স্বার্থহীন শত্রুতা। প্রবৃত্তির ছোঁয়ামুক্ত চমৎকার এ আদর্শ দেখে তখনই সে মুসলমান হয়ে গেলো।

গল্পের তোহফা:

সাহাবায়ে কেরামের জীবনে স্বার্থপরতা এবং প্রতিহিংসার লেশমাত্র ছিলোনা। তাদের বন্ধুতা এবং শত্রুতা সবই ছিলো আল্লাহর জন্যে।

শেষ নবীর খোঁজে

যায়েদ ইবনে সা'নাহ। ইয়াহুদীদের বড় পণ্ডিত। তাওরাতের বিশেষজ্ঞ। প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক।

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বেরিয়েছেন। সাথে হযরত আলী ইবনে আবি তালেব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। এমন সময় এক গ্রাম্য ব্যক্তি সওয়ারী নিয়ে হাজির হলো। এক গ্রামের দুর্ভিক্ষের কথা বলে সেখানের মুসলমানদের জন্যে সাহায্য চাইলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর দিকে তাকালেন। তারপর নিজে থেকেই বললেন, আচ্ছা, তোমার কাছে তো কিছু নেই।

ঠিক এ সময়ে নবীজীর দিকে এগিয়ে এলো ইয়াহুদী পণ্ডিত যায়েদ ইবনে সা'নাহ। বললো, আমি আপনাকে কিছু নগদ অর্থ প্রদান করতে পারি। বিনিময়ে আপনি নির্দিষ্ট একটি সময়ের ভেতর অমুক বাগানের খেজুর আমাকে দেবেন।

নবীজী বললেন, শোনো ইয়াহুদী। নির্দিষ্ট বাগানের খেজুর দিতে পারবো না। তবে নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে তুমি টাকা দিতে পারো। সময় মতো তোমাকে খেজুর দিয়ে দেয়া হবে।

যায়েদ রাজি হয়ে গেলো। সে চাইছিলো যেকোনোভাবে নবীজীর সাথে একটা লেনদেন হোক। নিজের থলে খুলে আশি মিসকাল স্বর্ণ নবীজীকে অগ্রীম দিলো। নবীজী স্বর্ণ মুদ্রাগুলো ওই সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিকে দিয়ে বললেন, এগুলো নিয়ে তাদের সাহায্য করো।

কিছুদিন পর। নির্ধারিত সময় আসার তখনও দু' তিনদিন বাকি। নবীজী সেদিন এক সাহাবীর জানাযা আদায় করছিলেন। সাথে

ছিলেন আবু বকর, উমর সহ একদল সাহাবী। ঠিক সে সময়ে যায়েদ ইবনে সা'নাহ তার পাওনা আদায়ের জন্যে উপস্থিত হলো।

জানাযা শেষে নবীজী একটি দেয়ালের ছায়ায় বসার জন্যে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু তার আগেই নবীজীর জামা চেপে ধরলো যায়েদ। গোস্বা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, কী ব্যাপার মুহাম্মদ! তুমি কি পাওনা আদায় করবে না? খোদার কসম, আব্দুল মুত্তালিবের বংশের সবাই পাওনা আদায়ে গড়িমসি করে। তোমাদের টালবাহানা সম্পর্কে আমি আগে থেকেই জানতাম।

যায়েদ ইবনে সা'নাহ-র কথা শুনছিলেন হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। রাগে তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম। তিনি বললেন, এই আল্লাহর শত্রু, আল্লাহর রাসূলকে তুমি এমন কথা বলছো? আমার সামনে তাঁর সাথে এমন আচরণ করছো? আল্লাহর শপথ, যদি নবীজীর প্রাণের ঝুঁকি না থাকতো তরবারীর আঘাতে তোমার মাথা উড়িয়ে দিতাম।

নবীজী উমরের কথা শুনে মুচকি হাসলেন। বললেন, 'উমর, তোমার কাছ থেকে আমরা দু'জনই আরো ভালো কিছু আশা করছিলাম। ভালো হতো যদি তুমি রাগ না করে আমাকে পাওনা আদায়ের পরামর্শ দিতে আর তাকে ভালোভাবে চাইতে আদেশ করতে। যাও উমর, তার পাওনা আদায় করে দাও। সেই সাথে তোমার ধমকের বিনিময়ে তাকে বিশ সা' অতিরিক্ত খেজুর দিয়ে দাও।'

নবীজীর কথা অনুযায়ী হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার পাওনা পরিশোধ করলেন। অতিরিক্ত বিশ সা' পেয়ে যায়েদ ইবনে সা'নাহ অবাক হলেন। বললেন, এ অতিরিক্ত খেজুর কী জন্যে?

উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ। তোমার সাথে কঠোরতার বিনিময়।

যায়েদ ইবনে সা'নাহ বললেন, উমর, আমাকে চেনো?

উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, কে তুমি?

- আমি যায়েদ ইবনে সা'নাহ।

- সেই ইয়াহুদী পণ্ডিত?

- হ্যাঁ, সেই পণ্ডিত।

উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যায়েদ ইবনে সা'নার নাম ইতোপূর্বে শুনেছেন। তিনি অবাক হলেন। তাওরাতের এতো বড় পণ্ডিত। বিরাট সম্পদশালী মানুষ। সে কেন সামান্য কিছু পাওনার জন্যে নবীজীর সাথে এমন আচরণ করলো? তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কেন আল্লাহর রাসূলের সাথে এমন করতে গেলে?

যায়েদ ইবনে সা'নাহ বললেন, 'উমর, তাওরাতে থাকা শেষ নবীর আলামতগুলো আমি মেলাচ্ছিলাম নবীজীর সাথে। একে একে সবই মিলে গিয়েছিল। সবগুলোই দেখে ফেলেছিলাম তার মাঝে। কিন্তু দুটো আলামত মেলানো বাকি রয়ে গিয়েছিলো।

এক. শেষ নবীর সহিষ্ণুতা তার নির্বুদ্ধিতার ওপর প্রবল থাকবে।

দুই. তার সাথে কেউ মুর্খের আচরণ করলে তিনি সর্বোচ্চ সহনশীলতার পরিচয় দেবেন।

আমি সুযোগ খুঁজছিলাম। যেভাবেই হোক মুহাম্মদের সহনশীলতা কেমন তা মাপতে হবে। দেখতে হবে তার সহিষ্ণুতা আর নির্বুদ্ধিতার পরিমাণ। আমার লেনদেনের উদ্দেশ্য ছিলো এটাই। এ লেনদেনের

মাধ্যমে আজ আমি সে দুটো আলামতও নবীজীর মাঝে পেয়ে গেলাম। উমর, আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে সন্তুষ্ট চিত্তে-

আল্লাহকে আমার রব,

ইসলামকে আমার ধর্ম,

আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার নবী হিসেবে মেনে নিচ্ছি।'

উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সামনে ইসলাম গ্রহণ করার পর নবীজীর সামনে উপস্থিত হয়েও নিজের ইসলামের কথা প্রকাশ করলেন তিনি।

একদিনেই সফলতার পথে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন যায়েদ ইবনে সা'নাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। এরপর তাকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। সর্বশেষ তাবূকের জিহাদে তিনি অত্যন্ত সাহসের সাথে শত্রুপক্ষের দিকে এগিয়ে যান। এগিয়ে যান চিরশান্তির ঠিকানা জান্নাতের দিকে ...।

গল্পের তোহফা:

হেদায়াতের অন্বেষায় যে থাকে; তাকে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা সঠিক পথ দেখান।

গল্প তবে কল্প নয়

ঈমানের অনুভূতি

লোকটা আগে মুসলমান ছিলো। শুধু তাই নয়। ছিলো হাফেয এবং আলেম। এক মসজিদের ইমাম।

একদিন কি হলো- লোকটা উযু ছাড়া নামাযে ইমামতি করলো। এরপর কয়েকদিন কেটে গেলো। মনে মনে সে ভাবলো, উযু ছাড়া তো নামায পড়িয়ে দিলাম। কই, কোনো আযাব তো এলো না।

আল্লাহর আযাব আসে কিনা দেখার জন্যে সে মরিয়া ছিলো। তাই আরেকটু দুঃসাহস দেখিয়ে এবার সে গোসল ফরয অবস্থায় নামায পড়ালো। না, এবারো কোনো আযাব এলো না।

এখন তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেলো, আসলে আল্লাহ বলতে কেউ নেই। নাউযুবিল্লাহ। এই বিশ্বাসের কারণে সে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলো।

কিছুদিন পর তার দেখা হলো আরেক আলেমের সাথে। তার সামনে সে জোর গলায় দাবি করলো আল্লাহর অনস্তিত্বের কথা। দলীল হিসেবে পেশ করলো নিজের ঘটনা। বললো, আল্লাহ বলে কিছু থাকলে এতোদিনে আমার ওপর অবশ্যই আযাব আসতো।

সে আলেম মুচকি হেসে বললো, ভাবছো তোমার ওপর কোনো আযাব আসেনি? এ তোমার ভুল ধারণা। আরে, আযাব তো শুরু হয়ে গিয়েছে প্রথম দিন থেকেই।

প্রথম আযাব, উযু ছাড়া নামায পড়ানোর কারণে সব মুসল্লীর গুনাহ তোমার ঘাড়ে চেপেছে।

দ্বিতীয় আযাব, এ গুনাহ থেকে তাওবা তোমার নসীবে জোটেনি।

এরপর ধীরে ধীরে আযাবের পরিমাণ শুধুই বেড়েছে। এই যে তুমি বেঈমান হয়ে গেছো। ঈমানের নূর নিভে গেছে তোমার হৃদয় থেকে; এটাও তো আল্লাহর মস্ত বড় এক আযাব।

গল্পের তোহফা:

কিন্তু এ আযাব বুঝতে হলেও কিছু অনুভূতি থাকা দরকার। যদি কারো হৃদয় থেকে সে আযাব অনুধাবন করার শক্তিটুকুও হারিয়ে যায় তাহলে তো আর কিছুই করার থাকে না!

ইস্ মে ভী খায়ের হ্যায়...

রাজা হিন্দু ধর্মালম্বী। তার বিশেষ উপদেষ্টা মুসলমান। দরবারে এবং সফরে সবসময়ই সে রাজার সাথে থাকতো। রাজাও এ সহকারীর প্রতি ছিলেন খুবই অনুরক্ত। এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে হাতছাড়া করতে চাইতেন না।

রাজার এ উপদেষ্টার একটা বিশেষ অভ্যাস ছিলো, ভালো মন্দ যাই ঘটতো, সে শুধু বলতো, 'ইস্ মে ভী খায়ের হ্যায়। এর মধ্যেও কল্যাণ আছে।' যা হয়েছে ভালোর জন্যেই হয়েছে।

একবার রাজা গেছেন শিকারে। সাথে মুসলমান সহকারী। দিনের শুরুতে আবহাওয়া ভালোই ছিলো। হঠাৎ বৃষ্টি এলো। মুষলধারে বৃষ্টি। উপদেষ্টা সমেত রাজা বিপদে পড়ে গেলেন। কোনরকম একটা বড় গাছের নিচে আশ্রয় নিলেন। ভালো আবহাওয়া দেখে বের হয়েছিলেন। এমন হবে বুঝতে পারলে রাজা বেরই হতেন না।

অনেক্ষণ পরে বৃষ্টি কমলো। রাজার শিকারের ইচ্ছে শেষ হয়ে গেছে। রাজপ্রাসাদে ফেরার জন্যে রওয়ানা হলেন। বৃষ্টি কমলে কী হবে। পথঘাট হয়ে গেছে পিচ্ছিল ও বিপদশঙ্কুল। অনভ্যস্ত পায়ে রাজা হাঁটা শুরু করলেন।

কিন্তু যা আশঙ্কা করা হচ্ছিলো তাই হলো। কর্দমাক্ত পথে রাজার পা পিছলে গেলো। কাদায় মাখামাখি হয়ে সহকারীর কাঁধে ভর করে রাজপ্রাসাদে ফিরে বুঝতে পারলেন, অবস্থা ধারণার চাইতেও খারাপ। ডান পা'টা একেবারে ভেঙ্গে গেছে। রাজচিকিৎসক বলেছে পা'টা সারতে দীর্ঘদিন সময় লাগবে। এসময়টা রাজাকে পরিপূর্ণ শয্যাশায়ী থাকতে হবে।

এমন আশঙ্কাজনক অবস্থাতেও রাজার সে সহকারী বললো, 'ইস্ মে ভী খায়ের হ্যায়। এর মধ্যেও কল্যাণ আছে'। তার এ কথা শুনে

রাজা ভয়ঙ্করভাবে রেগে গেলেন। এমনকি তাকে নিজের সহকারীর পদ থেকে বরখাস্ত করে দরবার থেকে বিদায় করে দিলেন।

নিজের বরখাস্তের সংবাদ পেয়েও সেই ঈমানদার উজীর বললো, 'ইস মে ভী খায়ের হ্যায়। আমার চাকরি হারানোর মধ্যেও কল্যাণ আছে'।

*** *** *** ***

বেশ কিছুদিন পর। রাজার ভাঙ্গা পা' সেরে উঠেছে। তবে পা'টা মারাত্মকভাবে ভাঙ্গার কারণে কিছুটা খোড়া হয়ে গেছেন। হাটতে গেলে একদিকে কাত হয়ে হাটেন। এমন অবস্থাতেই তার শিকারে বের হতে ইচ্ছে করলো। আগে এ ধরনের সফরে রাজার সঙ্গ দিতো মুসলমান উপদেষ্টা। এখন সে চাকরিচ্যুত। সে কারণে রাজা একাই বের হলেন।

প্রহরী বিহীন রাজা একটা শিকারের পিছু নিয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেলেন। গভীর জঙ্গল থেকে ফেরার পথে এক ডাকাত দলের কবলে পরলেন তিনি। রাজার সাথে কোন অর্থকড়ি ছিলো না। তারপরও তার হাত পা' বেঁধে ডাকাত দল তাদের সর্দারের কাছে নিয়ে গেলো।

সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর রাজা বুঝতে পারলেন অর্থকড়ি না পেয়েও তাকে ধরে আনার কারণ হলো, প্রতি বছর এই ডাকাত দল নিজেদের দেবতার উদ্দেশ্যে একজন সুস্থ-সবল মানুষকে বলি দেয়। রাজার নাদুস নুদুস শরীর তাদের খুবই পছন্দ হয়েছে। সে কারণেই তাকে বলি দিতে সর্দারের কাছে নিয়ে এসেছে।

ডাকাত সর্দার রাজাকে দেখলেন। বলি দেয়ার জন্যে আপাতদৃষ্টিতে খুবই উপযুক্ত মনে হচ্ছে। এমন নাদুস নুদুস নিখুঁত মানুষকেই বলি দেয়ার জন্যে খোঁজা হচ্ছিলো। 'নিখুঁত' শব্দটা মনে আসতেই তার

মনে হলো- আরে, ধরে আনা লোকটার তো হাত পা' বাঁধা। একটু হাটিয়ে দেখলে কেমন হয়। নিখুঁত হওয়ার জন্যে তো শারীরিক গঠনের পাশাপাশি চলন-বলনও সুন্দর হতে হয়।

রাজাকে হাত পা'র বাঁধন খুলে হাটানো হলো। সামান্য চলার পরই চোখ কপালে উঠলো ডাকাত সর্দারের। আরে, এতো দেখছি খোড়া। না, না, একে দিয়ে বলির কাজ হবে না। এই খোড়াকে বলি দিলে দেবতা তুষ্ট না হয়ে আরো রুষ্ট হবেন। জলদি একে ছেড়ে দাও।

*** *** *** ***

রাজদরবারে ফিরেই রাজা মন্ত্রীকে পাঠিয়ে তার সে মুসলমান সহকারীকে সসম্মানে তলব করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন, আগের সফরে তার পা'টা ভেঙ্গে যাওয়ায় আজ তার জীবনটাই বেঁচে গেছে। সুতরাং তার পা' ভাঙ্গার পর মুসলমান উপদেষ্টা যে বলেছে- ইস্ মে ভী খায়ের হ্যায়, তা যথার্থই বলেছে।

তারপরও একটা প্রশ্ন রাজার মনে ঘুরপাক খেতে থাকে। তিনি উপদেষ্টাকে বলেন, 'আমার পা' ভাঙ্গার মধ্যে যে কল্যাণ ছিলো তাতো বুঝতে পাললাম। কিন্তু তোমার চাকরি হারানোর মধ্যে কী কল্যাণ ছিলো? চাকরি হারিয়েও তো তুমি বলেছ, ইস্ মে ভী খায়ের হ্যায়!

ঈমানদার উপদেষ্টা উত্তর দিলো, 'রাজা মশায়, এখনো বোঝেন নি, কী কল্যাণ ছিলো!

আমি যদি চাকরিতে বহাল থাকতাম তাহলে তো স্বাভাবিকভাবেই আপনার সাথে শিকারের সফরে থাকতাম। কারণ, এধরনের সফরে আমি ছাড়া কেউ আপনার সাথে থাকার কথা না।

আপনার সাথে সফরে থাকলে আমরা দুজনই ডাকাতদলের হাতে বন্দী হতাম। ডাকাত দল বলি দেয়ার জন্যে আপনাকে পছন্দ করলেও আমাকে সাথে নিয়ে যেতো। যেন আমি তাদের আস্তানার খবর কাউকে না বলতে পারি।

এরপর যখন আপনার খুঁত প্রকাশ পেতো তখন আপনার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে আমাকেই বলি দিতো। কারণ, আপনার শরীরে খুঁতযুক্ত হয়ে গেলেও আমার শরীর তো এখনো নিখুঁত।

এবার বুঝতে পেরেছেন চাকরি হারানোর মধ্যেও আমার জন্যে কী বিরাট কল্যাণ ছিলো? আপনাকে বাঁচানোর সাথে সাথে আল্লাহ আমার প্রাণও রক্ষা করেছেন।

রাজা সেই মুসলিম উজীরকে আগের পদে বহাল করলেন। ঈমানদার উজীরের মুখ থেকে খুব স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হলো, ইস্ মে ভী খায়ের হ্যায়...।

গল্পের তোহফা:

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটি বিষয় আমাদের ভালোর জন্যেই হয়। কিছু হয়তো আমরা বুঝতে পারি, কিছু বুঝতে পারি না। সেজন্যে আল্লাহর ইচ্ছের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়ার মধ্যেই রয়েছে অন্তরের প্রশান্তি।

রাজ্য ও রাজকন্যা

জারিফ আহমদ। একজন মেধাবী তরুণ। ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। কিছুদিন হলো কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে বেরিয়েছে।

ছোটবেলা থেকে একটা সময় পর্যন্ত ধর্মের প্রতি জারিফের শ্রদ্ধাবোধ ছিলো। নামায পড়তো মাঝে মধ্যেই। ধর্মের অন্যান্য আচার আচরণেও সে অভ্যস্ত ছিলো। কিন্তু কিছুদিন হলো ধর্মের বেশকিছু ব্যাপারে জারিফের মনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। তাই দীন ঈমানের ওপর আগের মতো আর আস্থা রাখতে পারছে না।

ওর সবচে' বড় প্রশ্ন, 'বান্দাকে জান্নাত দিতে চাইলে তো আল্লাহ এমনিতেই দিতে পারেন। তার জন্যে আবার ইবাদত বন্দেগীর শর্ত করেছেন কেন?' এ জন্যে ওর কথা হলো, 'ইবাদতের কষ্ট করে জীবনের আনন্দ নষ্ট করার কোনো দরকার নেই। হাতে থাকা সময়গুলো ফুর্তির মধ্যে কাটিয়ে দেয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ!'

নিজের তৈরি প্রশ্নের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে জারিফ। অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে সেসব প্রশ্নের মাঝে। ঠিক এমন সময় তার জীবনে ঘটলো বড় বড় দু'টা ঘটনা। ওর বাবা মা একসাথে মারা গেলো রোড এক্সিডেন্টে। কয়েকদিন পরই শেয়ার বাজার ধ্বসে জারিফের সব অর্থ হাওয়া হয়ে গেলো। লোপাট হয়ে গেলো ওর কয়েক কোটি টাকা।

জারিফের দু'চোখে অন্ধকার নেমে এলো। জীবনকে মনে হলো কিনারাহীন। ওর অনেক স্বপ্ন ছিলো, একটা সফটওয়্যার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করার। এরপর ধীরে ধীরে টেকনোলজি জগতের সমস্ত পণ্য বাজারজাত করার ইচ্ছেও ছিলো ওর। সেসব স্বপ্ন পূরণ হওয়া তো

দূরের কথা, এখন বেঁচে থাকার অবলম্বন পাওয়াই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। মনে চাইছে একটা ফাঁসির দড়ি সংগ্রহ করে ঝুলে পড়তে।

*** *** *** ***

মাওলানা আবুল হাসান সাহেব। জারিফের এলাকার বিশিষ্ট আলেম ও দাঈ। ব্যবসায়ের জগতেও রয়েছে তার সরব পদচারণা। পারিবারিক ব্যবসায়ের সূত্রে তিনি এখন গ্রুপ অব ইন্ড্রাস্টির মালিক। ব্যবসায়িক একটা কাজে মিডলইস্টের সফর শেষে আজই দেশে ফিরেছেন।

এর আগে অনেকবার তিনি জারিফের মনের সন্দেহ নিরসন করার চেষ্টা করেছেন। সফল হননি। আজকে দেশে ফিরে জারিফের দূর্ঘটনার কথা জানতে পেরে তিনি মনে মনে একটা ছক আঁকলেন। তারপর দেখা করলেন ওর সাথে।

মাওলানা আবুল হাসান সাহেব জারিফকে অদ্ভুত একটা প্রস্তাব দিলেন। বললেন, 'আমি তোমাকে একশ' কোটি টাকা দেব। সম্মতি থাকলে তোমার সাথে বিয়ে দেব আমার মেয়েকে। তবে এর জন্যে আমার একটা শর্ত আছে।'

'কী শর্ত?' জারিফ আগ্রহভরে জানতে চাইলো।

'তোমাকে একদিন আমার কথামতো চলতে হবে। আমি যা বলি তাই করতে হবে। এরপর তুমি স্বাধীন। টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারো।'

এতো সামান্য শর্তের বিনিময়ে এত বিরাট পাওনা! জারিফের প্রথমে অবিশ্বাস লাগছিলো। কিন্তু মাওলানা সাহেব মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছেন না, এতটুকু আস্থা জারিফের আছে। এ আস্থা থেকেই ও মাওলানা সাহেবের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলো।

darsemansoor.com Install Islami Jindegi App islamijindegi.com

গল্পের তোহফা:

জারিফ এই প্রস্তাবে রাজি হওয়ার পর মাওলানা সাহেব আসল কথায় এলেন। বললেন, 'দেখো জারিফ, একশ' কোটি টাকার জন্যে তুমি একদিন আমার কথামতো চলতে কত সহজে রাজি হয়ে গেছো! একবারও বলোনি, আপনি দিতে চাইলে তো এমনিতেই দিতে পারেন। তার জন্যে আবার শর্ত কেন?

তুমি ভেবেছ, এতগুলো টাকা যে দেবে, সামান্য কিছু শর্ত দেয়ার অধিকার তার স্বাভাবিকভাবেই আছে। এ যুক্তি আর নিজের সারা জীবনের শান্তির কথা ভেবে তুমি একদিনের স্বাধীনতাকে হারাতে অনায়াসেই রাজি হয়ে গেছো।

সেই তুমিই তাহলে এটা কেন ভাবছো না, জান্নাতের অবারিত নেয়ামত যিনি দেবেন, তাঁরও রয়েছে কিছু শর্ত দেয়ার অধিকার! এরচে' বড় কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা আমাদের যেসব শর্ত দিয়েছেন সেগুলো খুবই সহজ ও সামান্য। কারণ, পরকালের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবনটা একদিনের চেয়েও কম। তাহলে এ সামান্য সময়ে আল্লাহর ইচ্ছেমত জীবনযাপন করতে সমস্যা কোথায়?

মেধাবী ছেলে জারিফ। বিষয়টা বুঝতে ওর সময় লাগলো না। সব প্রশ্নের জট নিমিষেই খুলে গেলো। নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছের কাছে সমর্পণ করতে আর কোনো দ্বিধা রইলো না।

দাম্পত্য চিকিৎসা

এক মহিলা খুব অশান্তিতে ছিলো। স্বামীর সাথে কিছুতেই বনিবনা হচ্ছিলো না। অনেক ভেবে সে মহিলা একজন হক্কানী পীরের কাছে তাবীয চেয়ে পাঠালো।

পীর সাহেব কিছু খোঁজ খবর নিয়ে সে মহিলার জন্যে পানিপড়া পাঠালেন। নিয়ম বলে দিলেন, যখন স্বামী রাগ করবে তখন স্ত্রীকে সে পানিপড়া মুখে নিয়ে রাখতে হবে। গেলা যাবে না।

কিছুদিন এ নিয়ম পালনের পর সংবাদ এলো- সে সংসারে অভূতপূর্ব শান্তি বিরাজ করছে।

পীর সাহেবের কাছের এক মুরীদ বিনয়ের সাথে বললো, 'হুজুর, আপনার পানিপড়া তো খুব সুন্দর কাজ করেছে। কিন্তু সে পানি ব্যবহারের নিয়মটি খুবই আজীব মনে হয়েছে। পানিপড়া মুখে রাখার নিয়মটি আগে কখনো শুনিনি'।

হুজুর বললেন, 'শোনো, সে সংসারে ঝগড়ার মূল কারণ ছিলো, স্ত্রী বেশি কথা বলতো। স্ত্রীর বিভিন্ন রকম কথা শুনে স্বামী আরো বেশি রেগে যেতো। পানি পড়া মুখে রাখার কারণে স্ত্রীর কথা বলা বন্ধ হয়েছে। সাথে সাথে সংসারে শান্তি ফিরে এসেছে।

গল্পের তোহফা:

হক্কানী পীর হিসেবে মুরীদদের সমস্যার সমাধান দিতে হলে ইলমের সাথে সাথে হিকমতও থাকতে হয়। মানুষের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জানতে হয় গভীরভাবে।

মনের বাঘ

গ্রামের মেঠোপথের ধারে একটা বাঁশঝাড়। এক লোক সেটার পাশ দিয়ে গ্রামে আসছিলো। গ্রামে পৌঁছেই লোকটা ভয়ে কাঁপতে লাগলো। লোকজন ব্যাপার বোঝার জন্যে তাকে ঘিরে ধরলো।

লোকটা ইঙ্গিত করলো বাঁশঝাড়ের দিকে। বললো, 'এইখানে অনেকগুলো বাঘ আছে।'

লোকজন তার কথা শুনে ঠোঁট উল্টালো। বললো, 'এত ছোটো জায়গায় অতগুলো বাঘ কী করে থাকতে পারে?'

লোকটা বললো, 'কমপক্ষে তিনটা বাঘ তো অবশ্যই আছে।'

গ্রামের লোকেরা এবারও প্রবলভাবে অস্বীকৃতি জানালো। বললো, 'তিনটা বাঘ থাকলেও কেউ না কেউ অবশ্যই দেখতো।'

লোকটা এবার হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বললো, 'একটা বাঘ তো নিশ্চিত আছে।'

সবাই তাকে বললো, 'আরে বোকা, একটা বাঘও যদি থাকতো, তাহলে কি মাঝে মাঝে সেটা লোকালয়ে হানা দিতো না? আমাদের গরু ছাগলের ওপর চড়াও হতো না?'

সে লোকের বিপুল উৎসাহ একদম চুপসে গেলো। মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো, 'আপনারা বলছেন, একটা বাঘও নেই। তাহলে আমি যে 'খস খস' আওয়াজ পেলাম সেটা কীসের?'

গল্পের তোহফা:

আহার, নিদ্রা এবং ভয়। তিনটা জিনিস খুবই আপেক্ষিক। যতো অভ্যাস করবে ততোই বাড়বে। ভয়কে যে বেশি প্রশ্রয় দিবে তাকে খাওয়ার জন্যে বনের বাঘের কোনো প্রয়োজন পড়বে না; মনের বাঘই যথেষ্ট।

দড়ি সমাচার

প্রাচীন এক কুয়া। অনেকদিন যাবৎ ব্যবহার হয় না। আগাছা আর লতাপাতা জন্মে কুয়ার মুখটা ঢেকে গেছে। ভালোভাবে লক্ষ না করলে চলার পথে হঠাৎ বোঝার উপায় নেই, এখানে একটা কুয়া আছে।

এক পথিক ব্যস্ত হয়ে কোথাও যাচ্ছিলো। খেয়াল করতে না পেরে সে পা দিয়ে ফেললো সেই কুয়ার মুখে। এক ঝটকায় নেমে গেলো পঞ্চাশ ফুট গভীরে। কুয়ার নিচে ছিলো আগাছা আর পাতার মোটা স্তর। হায়াতও ছিলো লোকটার, তাই প্রাণে বেঁচে রইলো।

প্রাথমিক ধাক্কা সামলামবার পর লোকটা বুঝতে পারলো, কুয়ার ভেতরের দেয়ালটা খুবই মসৃন। ভেতরে এমন কোনো খাঁজ বা ধরার বস্তু নেই যেটা অবলম্বন করে ওপরে ওঠা সম্ভব। বাইরের সাহায্য ছাড়া বাহ্যিকভাবে বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই। প্রাণ বাঁচাতে লোকটা চিৎকার শুরু করলো। তার চিৎকারে লোকজন এগিয়ে এলো। সবাই মিলে তাকে ওঠাবার চিন্তা শুরু করলো।

একজন বুদ্ধিমানের পরামর্শে কুয়ায় একটি দড়ি ফেলা হলো। লোকটাকে বলা হলো দড়িটা ভালো করে কোমরে বাঁধতে। এরপর সবাই মিলে টেনে তাকে ওপরে তুললো।

*** *** *** ***

কয়েকদিন পর। পাশের গ্রামের এক লোক লম্বা এক তাল গাছে উঠেছে। ওঠার সময় তো তরতর করে উঠে গেছে। কিন্তু ওপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে তার আত্মা খাঁচা ছাড়বার উপক্রম। এখন আর নামতে সাহস হচ্ছে না।

লোকেরা গাছের নিচে জড়ো হলো। কারো মাথায় বুদ্ধি আসছে না, কিভাবে ওকে নামানো যায়। অনেক্ষণ মাথা খাটাবার পরও যখন

কেউ কোনো সমাধান বের করতে পারলো না, এগিয়ে এলো এক ব্যক্তি। কুয়া থেকে মানুষ ওঠাবার ঘটনায় সে উপস্থিত ছিলো। তার পরামর্শ অনুযায়ী বিরাট এক দড়ি আনা হলো। তারপর সেটাকে বাঁশের মাধ্যমে পৌঁছানো হলো তাল গাছে থাকা লোকটার কাছে। তাকে আদেশ করা হলো দড়ির সাথে নিজেকে ভালোভাবে বেঁধে নিতে। এরপর ...।

হ্যাঁ, এরপর পরবর্তী পদক্ষেপের পালা। পরামর্শদাতার পরবর্তী আদেশে সবাই মিলে টান দিলো দড়িতে। লোকটার জমিনে নামার দরকার ছিলো। নেমেও এলো। কিন্তু যা হবার তাই হলো।

পুনশ্চ:
লোকটার মৃত্যুর পরও বুদ্ধিমান (!) পরামর্শদাতা বলছিলো, ঘটনাটা তো বুঝলাম না। আমি নিজের চক্ষে দেখলাম দড়ি দিয়া ওই লোকটারে কুয়া থিকা উঠাইলো। উঠানোর পরও তো লোকটা বাইচা ছিলো। কিন্তু এই লোকটা মইরা গেলো ক্যান? আমরা তো এরে দড়ি দিয়াই নামাইলাম!

গল্পের তোহফা:
সব পদ্ধতি সব জায়গায় কাজে লাগে না। সেজন্যে স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনাবোধ খুবই দরকার।

মেধাবল বনাম বাহুবল

বাদশাহর দরবারের দুই কর্মচারী। একজন জল্লাদ। অন্যজন উজীর। জল্লাদের স্বাস্থ্য ভালো। পেশিতে প্রচুর শক্তি। ফাঁসি ও অন্যান্য দণ্ড প্রয়োগ করতে তার এ বাহুবলের প্রয়োজন হয়।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে উজীর অতিসাধারণ। তার কাজও কম। রাজদরবারের কায়িক কর্মগুলোতে তার অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। তার মূল কাজ হচ্ছে, রাজাকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেয়া।

একদিন জল্লাদ রাজার কাছে কাচুমাচু করে অভিযোগ পেশ করলো। বাদশাহ নামদার, উজীরের চে' আমার শক্তি অনেক বেশি। রাজকার্যে আমার খাটুনিও বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু তার বেতন বেশি। আমারটা কম। এটা মেনে নিতে আমার কষ্ট হয়।

বাদশাহ বললেন, 'বিষয়টা আমি ভেবে দেখব। তার আগে তুমি এক কাজ করো। রাজপ্রাসাদের দরোজায় একটা মাদী কুকুরের বাচ্চা দেয়ার কথা। সেটার কী অবস্থা দেখে আসো।'

জল্লাদ খুব জলদি দেখে এসে জানায়, 'জি জাহাঁপনা, কুকুরটা বাচ্চা প্রসব করেছে'।

বাদশাহ বলেন, 'বাচ্চাগুলোর গায়ের রঙ কী?'

জল্লাদ বলে, 'বাদশাহ নামদার, আমি এক্ষুনি দেখে এসে বলছি'।

জল্লাদ বাচ্চাগুলোর গায়ের রঙ দেখে এসে জানায়।

বাদশাহ তাকে প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা, কয়টা বাচ্চা প্রসব করেছে?'

জল্লাদ উত্তর দেয়, 'সেটা তো লক্ষ করিনি'।

বাদশাহ বলেন, 'ঠিক আছে, দেখে আসো।'

জল্লাদ দেখে এসে জানায়, জাহাঁপনা, কুকুরটি মোট পাঁচটা বাচ্চা প্রসব করেছে।

বাদশাহ এবার বলেন, 'পাঁচটা বাচ্চার মধ্যে কয়টা নর, কয়টা মাদী?'

জল্লাদ বলে, 'জাহাঁপনা, আমি খুবই দুঃখিত, এটাও দেখে এসে বলতে হবে।'

জল্লাদ কুকুরের বাচ্চাগুলো আবার দেখে এসে বাদশাহকে নর মাদীর সংখ্যা জানায়।

বাদশাহ তাকে দাঁড়াতে বললেন। তার সামনেই তলব করলেন উজীরকে। বললেন, 'উজীর মহাশয়, প্রাসাদের দরোজায় একটা কুকুর গর্ভবতী ছিলো, দেখুন তো কী অবস্থা?'

উজীর দেখে এসে বাচ্চা প্রসবের কথা জানালেন। বাদশাহ তাকে প্রশ্ন করলেন,

- কয়টা বাচ্চা?

-পাঁচটা।

- গায়ের রঙ?

- দুটো কালো, দুটো বাদামী, একটা লাল।

- নর মাদী?

- তিনটা নর, দুটো মাদী।

- সবগুলো সুস্থ?

- মোটামুটি, তবে একটা অসুস্থ, দুধ খেতে পারছে না।

বাদশাহ বললেন, 'ঠিক আছে, দরবারের পশু চিকিৎসককে বলে সেটার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

গল্পের তোহফা:

উজীর চলে যাবার পর বাদশাহ জল্লাদের দিকে তাকালেন। বললেন, ‘তোমাকে চারবার পাঠিয়েও যে কাজটা করানো যায়নি সেটা উজীর একবারেই করে এসেছেন। এরপরও কি তুমি তার চাইতে বেশি বেতন আশা করো? মনে রাখবে, বাহুবলের চে’ মেধাবলের মূল্য অনেক বেশি।

জ্ঞানী ও ধনী

এক ধান ব্যবসায়ী বাজারে যাচ্ছে ধান বিক্রি করতে। তার কর্মচারী একটা লম্বা কাঠের দু' মাথায় দুটো টুকরি ঝুলিয়ে সেটা কাঁধে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। টুকরি দুটো ধানে ভর্তি।

বাজারে যাওয়ার পথেই অর্ধেক ধান বিক্রি হয়ে গেলো। একপাশের টুকরি খালি হয়ে গেছে। সে পাশটা হালকা হয়ে যাওয়ায় কর্মচারীটির বহন করতে কষ্ট হচ্ছে। বাজারে পৌঁছুতে এখনো বেশ বাকি। অনেক ভেবে লোকটা রাস্তা থেকে কিছু ইট পাথর সংগ্রহ করে খালি টুকরিটায় রেখে দিলো। এতে করে আবার দু'পাশের ভার সমান হয়ে গেলো।

এক জ্ঞানী ব্যক্তি এ অবস্থা দেখে খুবই আশ্চর্য হলেন। তিনি এগিয়ে এসে লোকটাকে বললেন, 'আপনার কর্মচারী তো খামকা কষ্ট করছে। একপাশের ধান অর্ধেক করে খালি টুকরিটায় দিলেই তো দু'দিকের ভার সমান হয়ে যায়।

লোকটা ভেবে দেখলো, তাইতো। তাড়াতাড়ি ইটগুলো ফেলে একপাশের টুকরি খালি করে সেটাতে অন্যপাশ থেকে অর্ধেক ধান রাখলো। বাহ, দুপাশের ভারই সমান। আবার ইটের বোঝা কমে যাওয়ায় অনেক হালকাও হয়ে গেছে।

কাজটা করার পর লোকটি জ্ঞানী ব্যক্তিটির সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করলো। হঠাৎ তার মনে হলো, এতো কম বুদ্ধির অধিকারী হওয়া পরও তো আমার মোটামুটি ভালোই ধন-সম্পদ আছে। তাহলে এই জ্ঞানী ব্যক্তিটির নিশ্চয়ই আরো অনেক সম্পদ আছে। সে নিশ্চয়ই আমার চাইতেও বড় ব্যবসায়ী।

darsemansoor.com Install Islami Jindegi App islamijindegi.com

ভাবতে ভাবতে লোকটা জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রশ্নই করে বসলো, জনাব, আপনার কর্মচারীরা মাল বহন করার সময় কি এই পদ্ধতিই অবলম্বন করে?

জ্ঞানী ব্যক্তি উত্তরে বললেন, 'না জনাব, আল্লাহ আমাকে ভালোই রেখেছেন। তবে আপনি যেমন ভাবছেন তেমন প্রাচুর্যে ভরা জীবন আমার নয়। আমি কোন ব্যবসায়ী নই এবং আমার কোন কর্মচারীও নেই। বরং আমি এক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করি।

জ্ঞানী ব্যক্তির কথা শুনে ধান ব্যবসায়ী আতকে উঠলো। তার মুখ থেকে আনমনেই বের হয়ে গেলো, 'বলেন কী, আপনার জ্ঞান তাহলে কী কাজে লাগলো! সেটাতো দেখছি আপনাকে ধনী বানাতে পারেনি। আপনার কাছ থেকে বুদ্ধি নিলে আমাকেও দারিদ্র তাড়া করবে।

ব্যবসায়ী কথাগুলো বলেই শুধু ক্ষান্ত হলো না। খুব দ্রুত ধানগুলো একপাশের টুকরিতে নিয়ে খালি টুকরিতে আবার ইট-পাথর তুলে নিলো।

গল্পের তোহফা:

জ্ঞানের কদর একমাত্র জ্ঞানীই করতে পারে। মূর্খের কাছে জ্ঞানের চেয়ে ইট-পাথরের দামই বেশি।

পানপাতার রাখাল

এক আলেম নিজে পান খেতেন না। কিন্তু পান খাওয়ার সরঞ্জামাদি সবসময় তার কাছে প্রস্তুত থাকতো। সঙ্গী সাথী ও মেহমানদের খুব শানদারভাবে পান খাওয়াতেন।

নিজে পানে অভ্যস্ত না হয়েও পান নিয়ে তার উৎসাহের বিষয়টা ছিল খুবই আশ্চর্যের। একদিন একজন তাকে জিজ্ঞেসই করে বসলো। হযরত, 'আপনি সবসময় আমাদের পান খাওয়ান। নিজে কখনই খান না। এর রহস্য কী?'

আলেম সাহেব মুচকি হেসে বলেন, ' ধৈর্য ও স্থিরতা আসার অন্যতম একটি মাধ্যম হলো বকরী প্রতিপালন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা অনেক নবীকেই ধৈর্যের পাঠ দান করেছেন। '

'কিন্তু হযরত!' প্রশ্নকারীর অবাক হওয়ার মাত্রা আরো বেড়ে যায়। 'বকরী চড়ানোর সাথে আপনার পান খাওয়ানোর কী সম্পর্ক?'

আলেম সাহেবের হাসিটা আরেকটু চওড়া হলো। নিজের সঙ্গী সাথীদের ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তাদের ব্যাপারে রসিকতা করলে তারা কষ্ট পাবেন না। তাই তিনি রসিকতা করে বললেন, 'বকরী প্রতিপালন তো আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালামের সুন্নত। এই সুন্নতটা আমি ছোটবেলায় পালন করতে পারিনি, তাই আমার কাছে আগত মানুষদের পান চাবানো দেখে নিজেকে রাখাল কল্পনা করি।'

গল্পের তোহফা:

রসিকতার মধ্যেও সুন্নতের স্মরণ। খুবই চমৎকার একটি বিষয়। তবে রসিকতার সময় অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে যেনো সেটি কারো মর্যাদাক্ষুণকারী এবং কষ্টের কারণ না হয়।

জাহেলে মুরাক্কাব

এক লোক যুদ্ধের ময়দান থেকে এসেছে। এসেই খুব বড়াই করছে। বলছে, আজকে আমার হাত থেকে কেউ নিস্তার পায়নি। হাজার হাজার শত্রুর পা' কেটে দিয়েছি। আলাদা করে দিয়েছি শরীর থেকে।

সে লোকের 'হামবড়া' ভাব দেখে এক লোক প্রশ্ন করে বসলো, তুমি শত্রুর গলা না কেটে পা কাটতে গেলে কেন?

কথিত বীর ভ্রু কুঁচকে তাকালো প্রশ্নকারীর দিকে। বললো, এটাও বোঝো না! আরে, গলা তো তাদের আগে থেকেই কাটা ছিলো। এখন আমি সেই কাটা গলা আবার কাটতে যাবো? এতটাই বোকা মনে করেছো আমাকে?

লোকটার কথা শুনে প্রশ্নকারী একেবারে চুপ হয়ে গেলো। কী আর বলা যাবে এই জাহেলে মুরাক্কাবকে?

গল্পের তোহফা:

যে লোক অজ্ঞ কিন্তু নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে জানে তাকে বলা হয় জাহেল বা মূর্খ। আর নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে যার কোন খবর নেই। বরং অজ্ঞতা সত্ত্বেও নিজেকে অনেক জ্ঞানী মনে করে তাকে বলা হয় জাহেলে মুরাক্কাব। দ্বিগুণ মূর্খ।

গজাল কাহিনী

খুলনা অঞ্চলের প্রসিদ্ধ একটা শব্দ হলো ‘গজাল’। যেসব মানুষ স্থান-কাল-পাত্র বোঝার চেষ্টা না করেই কিছু করে ফেলে বা বলে ফেলে; তাদেরকে সে অঞ্চলে গজাল বলে।

এমনি এক গজালের কাহিনী। নির্বুদ্ধিতার কারণে সে নিজ এলাকায় গজাল হিসাবে পরিচিত ছিলো। প্রত্যেকটা কাজে তাকে শুনতে হতো গজাল সম্বোধন। রাগে দুঃখে সে সিদ্ধান্ত নিলো, এই এলাকায় সে আর থাকবে না। এমন কোন এলাকায় চলে যাবে যেখানের লোকজন তাকে গজাল হিসেবে চেনে না।

যা ভাবা তাই কাজ। লোকটা একদিকে রওয়ানা হয়ে গেলো। এলাকার পর এলাকা ত্যাগ করে চলতে লাগলো। সামনে একটা নদী। খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা আছে। যাত্রীরা নৌকার অপেক্ষায় পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক সময় নৌকা এলো। ঘাটে এখনো পুরোপুরি ভীড়েনি। নৌকা ঘাটে ভীড়লে প্রথমে ওপারের যাত্রীরা নামবে। তারপর এপারের যাত্রীরা উঠবে। সে জন্যে সবাই সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষা করছে।

কিন্তু সে লোকটার তর সইলো না। নৌকাটা ঘাটে ভেড়ার আগেই সে এক লাফে নৌকায় উঠে পড়লো। নৌকা প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠলো। যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে গেলো। সবার মুখ দিয়ে সমস্বরে বের হয়ে এলো, ‘এই গজালটা আবার কোত্থেকে এলো রে?’

যাত্রীদের এ কথা শুনে লোকটা খুবই আশ্চর্য হলো। আরে, আমি যে গজাল তা এখানকার লোকেরা কিভাবে জানলো! মনে মনে কিছুটা দুঃখও অনুভব করলো। যাহ, যেই গজাল শব্দের কারণে এলাকা ছাড়লাম সেই শব্দ এখনো শুনতে হচ্ছে।

darsemansoor.com Install Islami Jindegi App islamijindegi.com

গল্পের তোহফা:

কিন্তু আফসোস করে কী লাভ। এলাকা ছাড়লেই তো আর বেকুবী পিছু ছাড়ে না। বেকুবীকে ত্যাগ করতে হলে আলাদাভাবে তরবিয়ত নিতে হয়।

বিচ্ছু রেখে হাতে...

এক লোকের হাতে বিচ্ছু দংশন করছে। সে চিৎকার করে বলছে, কে আছ আমাকে বাঁচাও, যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছি।

লোকেরা ছুটে এসে দেখলো, বিচ্ছুটা যথারীতি তার হাত কামড়ে আছে। সবাই তাকে বললো, আরে তুমি তোমার হাতটা ঝাড়া দিচ্ছো না কেন, তাহলেই তো বিচ্ছুটা দূরে ছিটকে পড়বে!

লোকটা বললো, 'না, এটাকে সরানো যাবে না। বিচ্ছুটাকে হাতে রেখেই আমার ব্যথা কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

তার কথা শুনে সবাই একে একে কেটে পড়লো।

গল্পের তোহফা:

বিচ্ছুটাকে হাতে রেখেই সে ব্যথার মলম চাচ্ছে। এভাবে কি ব্যথা কমবে? সমস্যার মূল কারণকে না সরিয়ে সমাধান কখনোই সম্ভব নয়।

ছাত্র মানেই প্রশ্ন

এক লোক খেলা দেখাবে। খেলা দেখানোর আগে সে শর্ত দিলো, ভাইয়েরা, এখানে কোন ছাত্র থাকলে আমি খেলা দেখাবো না। শর্ত শুনে লোকেরা সেখানে উপস্থিত ছাত্রদেরকে সরিয়ে দিলো।

এরপর লোকটা খেলা দেখানো শুরু করলো। একটা পাতা বের করে বললো, এই পাতাটা বড়ই আজীব পাতা। এটা পানিতে পড়লে কুমীর হয়ে যায় আবার মাটিতে পড়লে বাঘে পরিণত হয়।

তার প্রদর্শিত পাতাটা দেখে লোকেরা খুবই অবাক হলো। পাতাটা একটু ছুঁয়ে দেখার জন্যে সবাই হুড়োহুড়ি শুরু করলো।

এক কমবয়সী ছাত্র লোকের ভীড়ে সেখানে রয়ে গিয়েছিলো। সে প্রশ্ন করে বসলো, 'যদি পাতাটা অর্ধেক পানিতে আর অর্ধেক মাটিতে পরে তাহলে কী হবে'?

ছাত্রটির এ প্রশ্নে লোকটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। বললো, 'আগেই বলেছিলাম, কোন ছাত্র থাকলে আমি খেলা দেখাবো না'।

গল্পের তোহফা:

এজন্যেই আকাবিরগণ বলে গেছেন,

"طالب علم وہ ہے جسکے ذہن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی سوال چکر کاٹے "

"তালেবে ইলম এমন মানুষকে বলে, যার মাথায় সবসময় কোন না কোন প্রশ্ন ঘুরপাক খায়।"

সংক্ষেপে আফসোস

মুফতী সাহেব হুজুরের এক শ্রেণি নিচে এক ছাত্র ছিলো। জামা'আতের সম্মিলিত কোন কাজেই সেই ছাত্রের নাগাল পাওয়া যেতো না।

তবে কাজ শেষ হওয়ার পরপরই হাজির হয়ে যেতো সে। আফসোস করে বলতো, 'আহা, কাজ শেষ হয়ে গেলো। আমি তো থাকতে পারলাম না।'

এতটুকু বলেই সে ছাত্র আবার নিজের কাজে লেগে যেতো। যেন কিছুই হয়নি। পরবর্তী কাজের সময় আবার গায়েব।

একদিন সবাই মিলে তাকে ধরলো। বললো, 'শোন, কাজ করতে পারলে করলে করবে না করলে নাই। তোমাকে ছাড়াই আমাদের কাজ হয়ে যায়। শেষমেষ এসে তোমার এই সংক্ষেপে আফসোসের কোনো দরকার নাই।

গল্পের তোহফা:

তখন থেকেই ছাত্রমহলে কথাটা প্রবাদে পরিণত হয়। কাজে ফাঁকি দেয়ার অপর নাম হয়ে যায় সংক্ষেপে আফসোস করা।

অর্ধেক রাজ্যের বিনিময়ে

এক বাদশাহর খেয়াল চাপলো- রাজ্যে তার চে' প্রখর মেধার অধিকারী কেউ আছে কিনা পরীক্ষা করবে। সেজন্যে রাজ্যময় ঘোষণা করে দেয়া হলো- কেউ যদি বাদশাকে নতুন কোন ঘটনা শোনাতে পারে তাহলে তাকে অর্ধেক রাজ্য লিখে দেয়া হবে। সেই সাথে এটাও ঘোষণা করা হলো- যদি কেউ ঘটনা শোনাতে এসে নতুন কিছু বলতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার গর্দান যাবে।

অর্ধেক রাজ্যের লোভে মানুষ দলে দলে আসতে লাগলো। কিন্তু দেখা গেলো বিষয়টাকে যতোটা সহজ মনে করা হয়েছিলো ততোটা সহজ নয়। বাদশাহকে যেই ঘটনাই শোনানো হয়, নিজের প্রখর মেধাবলে একবার শুনেই সে ঘটনা তিনি হুবহু শুনিয়ে দেন। বলেন, এ ঘটনা তো আমি আগে থেকেই জানি।

লোকেরা ভীষণ বিপদে পড়ে গেলো। ঘটনাটা বাদশার কাছে নতুন না পুরান তা বুঝতে হলে একবার তো কমপক্ষে তাকে শোনাতেই হবে। কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন ঘটনাও মাত্র একবার শুনেই বাদশাহ হুবহু শুনিয়ে দিচ্ছেন। কোনভাবেই বাদশাহর মুখ থেকে নতুনত্বের স্বীকৃতি আদায় করা যাচ্ছে না। বরং ব্যর্থতার দায়ে সবাইকে বন্দী করা হয়েছে। নতুন ঘটনা শোনাতে না পারায় এদেরকে হত্যা করা হবে।

এতগুলো মানুষের জীবন বিপন্ন দেখে একজন বুদ্ধিমান মানুষ এগিয়ে এলেন। বাদশাহ তাকে আগেই সতর্ক করলেন। 'দেখো, অনেক লোক এরিমধ্যে এসেছে। নতুন ঘটনা শোনাতে না পেরে সবাই মৃত্যুর প্রহর গুনছে। ওদের কাতারে যেতে না চাইলে আগেই সটকে পড়'।

darsemansoor.com Install Islami Jindegi App islamijindegi.com

বাদশাহর সতর্কবাণীর পরও লোকটা রাজি হলো। বাদশাহ মন্ত্রীকে নিয়ে ঘটনা শুনতে বসলেন। লোকটা বলতে শুরু করলো, ‘বাদশাহ নামদার! অনেক আগের কথা। এদেশের সিংহাসনে তখন আপনার পিতা। একদিন আপনার পিতা নির্জন এক কুয়ায় পড়ে গিয়েছিলেন। আমার পিতা তখন তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করেছিলেন। আপনার মরহুম পিতা আমার পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তাকে কথা দিয়েছিলেন অর্ধেক রাজ্য লিখে দেবেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই আপনার পিতার ইন্তেকাল হয়ে যায়। ফলে তিনি তার ওয়াদা পূরণ করে যেতে পারেন নি। এই হলো ঘটনা।’

ঘটনাটা শুনে বাদশাহ দ্বিমুখী চাপে পড়ে গেলেন। যেদিকেই যান অর্ধেক রাজ্য চলে যায়। যদি বলেন, ঘটনাটা আমি আগে থেকেই জানি তাহলে বলা হবে, ঠিক আছে, আপনি আপনার পিতার ওয়াদা আপনি পূরণ করুন। পিতার ওয়াদা পূরণ করাও তো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আর যদি বলেন, ঘটনাটা আমার জানা নেই। তাহলেও নতুন ঘটনা শোনানোর বিনিময়ে সে পেয়ে যাবে অর্ধেক রাজ্য।

বাদশাহ চোখে অন্ধকার দেখছেন। নিজের হাতে অর্ধেক রাজত্ব অন্যের হাতে তুলে দিতে হবে। কিন্তু করার কিছুই নেই। অর্ধেক রাজ্যের মায়া ত্যাগ করতেই হবে। কৃত ওয়াদা পূরণ করতে না পারলে বাকী অর্ধেকেও তার কোন মূল্য থাকবে না। তিনি সে ব্যক্তিকে অর্ধেক রাজ্যের দলিল করে দিলেন।

দলিল হাতে পেয়েই সে ব্যক্তি বললো, ‘বাদশাহ, আমার অংশের এ রাজ্য আমি বিক্রি করতে চাই। আপনি কি কিনতে চান?

বাদশাহ অবাক হলেন। বলে কী এই লোক! রাজ্য বুঝে পেতে না পেতেই বিক্রি। কোন চালাকি নেই তো। বাদশাহর আশঙ্কা হচ্ছে।

আবার নিজের রাজ্য ফিরে পাবার আগ্রহও তার আছে। আশঙ্কার সাথেই জিজ্ঞেস করলেন, বিনিময়ে তুমি কী চাও?

লোকটি বললো, ‘আপনাকে নতুন ঘটনা শোনাতে না পারা সকল বন্দীর মুক্তি চাই।

বাদশাহ লজ্জিত হলেন। রাজত্ব পেয়েও তার বিনিময়ে এই লোক বেগুনাহ মানুষগুলোকে বাঁচাতে চাচ্ছে। আর তিনি এদের বাদশাহ হয়ে কিনা হত্যার খেয়ালিতে মেতে উঠছেন। সবাইকে মুক্তি দিয়ে বাদশাহ বুদ্ধিমান লোকটাকে নিজের পরামর্শদাতা বানিয়ে নিলেন।

গল্পের তোহফা:

নিজেকে সবজান্তা ভাবার কোনো কারণ নেই। জ্ঞান বুদ্ধিতে কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

চোরের যুক্তি

একদল চোর সবসময় সঙ্ঘবদ্ধভাবে চুরি করতো। চুরির কাজে তারা ছিলো খুবই পারদর্শী। দেশের মানুষ তাদের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠছিলো। কোনভাবেই চোরের দলটাকে ধরা যাচ্ছিলো না।

জনসাধারণের জোর দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার একদল চৌকস গোয়েন্দা নিয়োগ দিলো। গোয়েন্দারা তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করে চোরের দলটাকে আটক করে বিচারের সম্মুখীন করলো।

আদালতের কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে চোরদের দলনেতা বললো, 'মাননীয় বিচারক, বিচার শুরু হওয়ার আগে আমার কিছু কথা আছে।' তার কথা শুনে আদালত কক্ষের সবাই নড়েচড়ে উঠলো। কী বলতে চায় দলনেতা!

বিচারকের অনুমতির পর দলনেতা বলতে শুরু করলো, 'মাননীয় বিচারক, আমরা মূলত অসংখ্য মানুষের কল্যাণ চিন্তায় চুরি করে থাকি। আমাদের চুরির পেছনে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ লুকিয়ে আছে।'

দলনেতার কথা শুনে এবার বিচারকও নড়েচড়ে বসলেন। বলে কী, চুরির পেছনে দেশের স্বার্থ! বললেন, 'ঠিক আছে, বিষয়টা তুমি আমাদের বুঝিয়ে বলো।'

চোরনেতা বললো, 'আমরা চুরি করছি বলেই দেশে অসংখ্য আলমারি তৈরি হচ্ছে। এ শিল্পের মাধ্যমে হাজারো মিস্ত্রির জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে। আমাদের চুরির ভয়েই দেশে লক্ষ লক্ষ তালা বিক্রি হচ্ছে। মানুষ ব্যাংকে টাকা রাখছে। ফলে ব্যাংকগুলো হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করতে পারছে। লাখো মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে সেগুলোতে। আমরা চুরি বন্ধ করে দিলে এই সব কিছুই বন্ধ হয়ে যেতো।

আমাদের অবদান কম নয় মাননীয় বিচারক। দেশে বর্তমানে অসংখ্য চুরির মামলা হচ্ছে; এসব মামলার মাধ্যমে হাজার হাজার উকিল-জজ-ব্যারিস্টারের উপার্জনের পথ সুগম হচ্ছে; এটাও তো আমাদের অবদান।'

চোরনেতার বক্তব্যের পর অনেকে ভাবছিলো, এবারও বোধহয় চোরের দল বেঁচে যাবে। দলনেতার এমন অকাট্য যুক্তির উত্তর দেয়া তো অসম্ভব।

কিন্ত বিচারক ছিলেন বিচক্ষণ এবং শরঈ বিষয়ে জ্ঞাত। তিনি বললেন, 'তোমরা অনেক মানুষের কল্যাণচিন্তা করেছো বটে। কিন্তু সেটা করতে করতে নিজেদের কথা ভাবতেই ভুলে গেছো। একটু চিন্তা করলেই তোমরা বুঝতে পারতে- নিজের জন্যে কল্যাণকামনার প্রথম ধাপ হলো, নিজেকে অন্যায় থেকে বাঁচানো। এটাই হচ্ছে প্রত্যেকের প্রথম কর্তব্য। সেই কর্তব্য আদায় না করে অন্যের কল্যাণচিন্তা করতে কে তোমাদের বলেছিলো? মিস্ত্রি, তালা ব্যবসায়ী, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ, উকিল, বিচারক সবাই মিলে কি তোমাদের দায়িত্ব দিয়েছিলো তাদের জীবিকার কথা চিন্তা করতে? বিচারকের বক্তব্য শুনে চোরনেতার মাথা নিচু হয়ে গেলো।

গল্পের তোহফা:

১. দুনিয়ার বিচারেই যদি এমন যুক্তি কাজে না লাগে তাহলে কিয়ামতের দিন যদি আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে বলি, 'হে আল্লাহ, আমরা নিজেদের প্রয়োজনে গুনাহ করিনি; নিজেদের প্রয়োজনে হারাম পথে উপার্জন করিনি। বরং বিবি, বাচ্চা, ভাই, বোন, সংসার ইত্যাদির প্রয়োজনে আমাদেরকে হারাম পথে যেতে হয়েছে, - এ ধরনের খোড়া যুক্তি কি আল্লাহর দরবারে টিকবে?

২. প্রত্যেক বাতিল দলই নিজেদের পক্ষে কোনো না কোনো যুক্তি পেশ করে। কিন্তু যুক্তি দিতে পারলেই কোনো বিষয় গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় না। গ্রহণযোগ্য হতে হলে যুক্তির পাশাপাশি বাস্তবতাও থাকতে হয়।

অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর

আরবীতে একটা প্রবাদ আছে-

زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا.

এ প্রবাদের সরল অর্থ হলো, ‘বিরতি দিয়ে দেখা করো, মহব্বত বাড়বে।’ অর্থাৎ কারো সাথে ঘন ঘন দেখা করলে মহব্বত কমে যায়। সুতরাং মহব্বত অটুট রাখতে হলে ঘন ঘন দেখা না করে মাঝে মাঝে বিরতি দাও।

এক লোক সামান্য কিছু আরবী জানতো। কিন্তু অনেক কিছু জানার ভাব দেখাতো। একবার তার সামনে লোকেরা একটা প্রাচীন আরবী কিতাব নিয়ে এলো। সে কিতাবে এ আরবী প্রবাদটা লেখা ছিলো। কিন্তু সে কিতাবের সব লেখা ছিলো যবর-যের-পেশ বিহীন। ফলে প্রবাদটা দেখাচ্ছিলো এমন-

زرغبا تزدد حبا.

সে ব্যক্তি বাক্যটাতে বহু কষ্টে নিজের মনমতো যবর-যের লাগালো। মনগড়া যবর-যের লাগানোর পাশাপাশি গাইন -এর নুকতাকে বানালো সাকিন। বা-কে পড়লো নূন। তার বিদ্যার জোরে বাক্যটার আকৃতি হলো এই-

زَرَعْنا تَزْدَدْ حَنّا.

এই হাস্যকর সূরতে বাক্যটাকে পড়ার পর সে আবার নিজের মতো করে ব্যাখ্যাও করলো। বললো, এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে- অনেক আগে একটা কওম ছিলো। তারা আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়েছিলো। ফলে তাদের উপর নেমে এসেছিলো আল্লাহর আযাব। এজন্যেই তারা বলেছিলো- ‘হায়, আমরা তো শস্য রোপণ করেছিলাম। কিন্তু (আল্লাহর আযাবে) সব শস্য মেহেদী গাছে পরিণত হয়েছে।

গল্পের তোহফা:

অসম্পূর্ণ জ্ঞান সবসমসয়ই আশঙ্কাজনক। কারণ, অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির মনে কখনই নিজের অসম্পূর্ণতার অনুভূতি সৃষ্টি হয় না।

বখীলের যোগ্য ছেলে

এক কৃপণ ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠেছে। উযু ইস্তেঞ্জা করার জন্যে মোমবাতি জ্বেলেছে। নামাযের প্রস্তুতি শেষ করে রওয়ানা হয়েছে মসজিদের দিকে।

মসজিদে প্রবেশ করতেই তার মনে হলো- আরে, মোমবাতিটা তো নিভিয়ে আসিনি। কাউকে বলেও আসিনি। বাসায় অবশ্য ছোট ছেলেটা আছে। কিন্তু তার যে আক্কেল; তাতে সে নেভাবে বলে মনে হয় না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো। নামাযের আরো দশ মিনিট বাকী। নামায পড়তে লাগবে কমপক্ষে দশ মিনিট। বাসায় ফিরতে পাঁচ মিনিট। এই পঁচিশ মিনিটে মোমবাতির হায়াত শেষ হয়ে যাবে।

ভেবে ভেবে তার শরীর ঘেমে উঠলো। নাহ, নামাযের আগেই বাসায় গিয়ে মোম নিভিয়ে আসতে হবে। ভেবে আর দেরি করলো না সে। রওয়ানা হয়ে গেলো বাসার দিকে।

বাবাকে এতো তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে দেখে ছেলে আশ্চর্য হয়। কী ব্যাপার বাবা, নামায শেষ? বাবা উত্তর দেয়, 'নামায শেষ হয়নি। মোমবাতিটা নেভানোর জন্যে আসতে হলো'।

ছেলে বিরক্ত হয়ে বলে, মোমবাতির চিন্তায় ফেরত এলে। তুমি বের হওয়ার সাথে সাথেই তো আমি সেটা নিভিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এর চে' দরকারি আরেকটা বিষয়ের প্রতি কি তুমি লক্ষ করেছ?

'কোন বিষয়ের কথা বলছিস?' বাবা প্রশ্ন করে।

ছেলের কুঞ্চিত ভ্রু আরো কুঞ্চিত হয়। বলে, 'বাবা, মোমবাতি নেভানোর জন্যে তোমার এই অনর্থক ফেরত আসায় যে কতটুকু জুতা ক্ষয় হয়ে গেলো সেটার কথা চিন্তা করেছ?

বাবার মুখে বিজয়ের হাসি। বলেন, ‘তোর বাপ আমি। আমি কি তোর চেয়ে কম বুঝি? দেখ তো আমার জুতা কোথায় আছে?

ছেলে বাবার দিকে ভালো করে লক্ষ করে আশ্বস্ত হয়। নাহ্, তার বাবা ভুল করেননি। মসজিদ থেকে ফেরত আসার সময় ঠিকই জুতাজোড়া বগলে তুলে নিয়েছেন।

গল্পের তোহফা:

বড়দের মধ্যে ভালো বা মন্দ যে অভ্যাসই থাকুক না কেনো; ছোটরা অবচেতনভাবেই সে অভ্যাস লালন করতে শুরু করে। সেজন্যে বড়দের উচিৎ- খুবই সচেতনভাবে নিজেদের মন্দ অভ্যাসগুলোকে ঝেড়ে ফেলা।

বড়দের দীপ্ত জীবন

এই হলো নিয়ত

ইমাম বুখারী রহ. একটা পণ্য বিক্রি করবেন। এক ক্রেতার সাথে কথা হলো। পাঁচ হাজার দেরহাম মুনাফা দিয়ে পণ্যটা নিতে চাইলো সে। ইমাম বুখারী তখনই পণ্যটা বিক্রি না করে বললেন, আজকের রাতটা আমি ভেবে দেখব।

ক্রেতা চলে যাওয়ার পর তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তার কাছে মনে হলো, ক্রেতার বলা দামটা ঠিকই আছে। মনে মনে তিনি এই ক্রেতার কাছেই বিক্রি করবেন বলে ঠিক করলেন।

পরদিন আরেক ক্রেতা এলো। সে লাভ দিতে চাইলো দশ হাজার দেরহাম। আগের ক্রেতা থেকে দ্বিগুণ। স্বাভাবিকভাবে এ ক্রেতার কাছে বিক্রি করার অধিকার আছে ইমাম বুখারীর। কারণ প্রথম ক্রেতার সাথে চুক্তি এখনো সম্পন্ন হয়নি। শুধু কথা হয়েছে। স্রেফ মাসআলার দিকে তাকালে সে ক্রেতার কাছে বিক্রি করা তার জন্যে জরুরী নয়।

কিন্তু তিনি ভাবলেন অন্য কথা। প্রথম ক্রেতার সাথে কথা চূড়ান্ত হয়নি তো কী হয়েছে? আমি তো তার কাছে বিক্রি করার নিয়ত ঠিকই করে ফেলেছিলাম। আল্লাহর সামনে আমি নিয়তভঙ্গকারী হতে চাই না।

এসব ভেবে দ্বীগুণমূল্যের প্রস্তাব পেয়েও নিয়তকে পাল্টাতে রাজি হলেন না ইমাম বুখারী। দ্বিতীয় ক্রেতাকে ফিরিয়ে দিলেন। জিনিসটা বিক্রি করলেন প্রথম ক্রেতার কাছেই।

গল্পের তোহফা:

ওয়াদার পাশাপাশি মুমিনের নিয়তেরও অনেক মূল্য রয়েছে। উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভালো কোনো নিয়তকে পরিবর্তন করাও তার জন্যে শোভনীয় নয়।

বাচ্চা পাওনাদার

শায়খ আহমাদ খাযরুয়াহ ছিলেন আতিথেয়তা এবং পরোপকারের জন্যে বিখ্যাত। তার কাছ থেকে সাহায্য ছাড়া কেউ ফিরে যেতো না। পরোপকারের জন্যে তিনি ঋণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। নিজের ঘর-বাড়ি, খানকাহ সবই তার ঋণের কারণে দায়বদ্ধ ছিলো।

তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত। সারা জীবনের ঋণের বোঝা তাঁর কাঁধে। ঋণ পরিশোধ করতে করতে ঘর-বাড়ি খানকাহ সব চলে গেছে। এরপরও রয়ে গেছে চারশ' দিনারের পাওনা। পাওনাদাররা জমা হয়ে আছে তার চারপাশে। সবাই নিজের পাওনার ব্যাপারে চিন্তিত। শায়খ চলে গেলে তাদের পাওনার কী হবে, এটাই সবার ভাবনা।

কিন্তু শায়খের চিন্তা দু'টি-
এক. এতগুলো লোক তার বাসায় এসেছে, এদের মেহমানদারী করা দরকার।

দুই. এদের পাওনাগুলোও মেটানো দরকার। কিন্তু বাহ্যিকভাবে কোন ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে না। তবে তার বিশ্বাস আছে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই একটা ব্যবস্থা করবেন।

শায়খের ভাবনার মাঝেই সেখানে উপস্থিত হলো এক বালক। মাথায় হালুয়ার পাত্র। হালুয়ার ফেরিওয়ালা। তার আওয়াজ পেয়ে শায়খ খাদেমকে ইশারা করলেন। সবটুকু হালুয়া কিনে উপস্থিত লোকদের খাওয়াতে বললেন।

খাদেম বালককে প্রশ্ন করলো, 'সবটুকু হালুয়া কত রাখবে?' ছেলে উত্তর দিলো, 'আধা দিনার থেকে একটু বেশি দিতে হবে।' খাদেম দামাদামি করে তাকে আধা দিনারে রাজি করলো।

কেনাবেচা সম্পন্ন হওয়ার পর ভেতরে প্রবেশ করে ছেলেটা হালুয়ার পাত্র শায়খের সামনে রাখলো। শায়খ সবাইকে হালুয়া খেতে আহ্বান করলেন। পাওনাদাররা হুমড়ি খেয়ে পড়লো হালুয়ার ওপর। পাওনাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাক বা না থাক। নগদ হালুয়া থেকে কেউ বঞ্চিত হতে চাইলো না।

কিছুক্ষণের মধ্যে হালুয়া শেষ হয়ে এলো। খুশীতে চকচক করে উঠলো বালকের মুখ। আজ খুব তাড়াতাড়ি বিক্রি শেষ হয়ে গেছে। এবার টাকাটা আব্বাকে দিয়েই ছুট দিবে সে। খেলাধূলার জন্যে আজ অ-নে-ক সময় পাওয়া যাবে।

হাসি হাসি মুখ নিয়ে বালক শায়খের দিকে এগুলো। হালুয়ার মূল্য পাবার প্রত্যাশায় হাত বাড়িয়ে দিলো তার দিকে।

শায়খ বললেন, ‘বেটা, আমার কাছে যদি দেয়ার মতো টাকা থাকতো, তাহলে কি এই লোকগুলো আমার সামনে বসে থাকতো? এই যে তুমি যাদেরকে দেখছো, সবাই আমার পাওনাদার। তুমিও এদের সাথে বসে পড়ো, দেখা যাক আল্লাহ তা‘আলা কোন ব্যবস্থা করেন কি না।’

শায়খের কথা শুনে আতঙ্কে লাল হয়ে উঠলো বালকের মুখ। সারা শরীরে ঘাম ছেড়ে দিলো। বাবাকে কী জবাব দেবে সে? তার সামনে খালি হাতে উপস্থিত হলে বিরাট অসুবিধা হয়ে যাবে। তার জন্যে কী মারাত্মক শাস্তি যে অপেক্ষা করছে তা কল্পনা করেই সে কাঁদতে লাগলো।

শায়খও এটাই চাইছিলেন। আল্লাহর কাছ থেকে ঋণমুক্তির ব্যবস্থা আদায়ের জন্যেই তিনি এমনটা করছিলেন। তিনি জানতেন, মাসুম বাচ্চার কান্না আল্লাহর দরবারে সাড়া ফেলে দেবে। এই কান্না শুনে আল্লাহ অবশ্যই কোনো না কোন ব্যবস্থা করবেন।

আসর পর্যন্ত ছেলেটা কাঁদতে লাগলো। নামাযের পর সবাই দেখলো, এক লোক তশতরী হাতে শায়খের দরবারে প্রবেশ করছে। শায়খের কোন ধনাঢ্য মুরীদ হাদিয়া পাঠিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তশতরীতে থাকা টাকা আর শায়খের ঋণের পরিমাণ এক। পূর্ণ চারশ' দিনার। সাথে খুচরা আধা দিনার।

গল্পের তোহফা:

বাচ্চাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত থাকে। অনেক সময় তাদের উসিলাতেই আমাদের দু'আ কবুল হয়। ছোট ও দুর্বলদের উসীলাতেই আমাদের রিযিক প্রদান করা হয়।

বুযুর্গীর রহস্য

হযরত শাহ আবুল হাসান খারকানী রহ.। সে সময়ের একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ। অনেক দূর দুরান্তর থেকে লোকজন তার মুরীদ হওয়ার জন্যে আসতো।

এক খোরাসানী ব্যক্তি শাহ সাহেবের প্রসিদ্ধির কথা শুনলো। তারও মন চাইলো হযরতের কাছে বাই'আত হবে। হাজার মাইল সফর করে সে উপস্থিত হলো শাহ সাহেবের বাড়িতে।

তিনি বাড়িতে ছিলেন না। খোরাসানী বাইরে থেকে সম্মানের সাথে প্রশ্ন করলো, 'হযরত কি বাড়িতে আছেন?'

অন্দর মহল থেকে বিবি সাহেবের কণ্ঠ ভেসে এলো, 'কিসের আবার হযরত? আমি তো রাতদিন তার কাছেই আছি। তার মধ্যে বুযুর্গীর কী আছে?'

খোরাসানী বেচারা ভেঙ্গে পড়লো। প্রতিবেশীদের কাছে আফসোস করে বললো, ' এত দূর থেকে এলাম মুরীদ হওয়ার জন্যে। আর বিবি সাহেবা বলছেন, তিনি বুযুর্গই নন!'

প্রতিবেশীরা তাকে সান্তনা দিলো। বললো, 'তুমি স্ত্রীর কথায় কান দিও না। ওই ময়দানে যাও। সেখানে শাহ সাহেবকে পাবে।'

সে তাই করলো। প্রতিবেশীদের কথা অনুযায়ী ময়দানের দিকে রওয়ানা হলো। দেখলো, শাহ সাহেব একটি বাঘের ওপর আরোহণ করে আসছেন। শুধু তাই নয়। লাকড়ির এক বোঝাও চাপিয়েছেন সে বাঘের ওপর।

শাহ সাহেব খোরাসানী ব্যক্তিকে দেখলেন। আঁচ করতে পারলেন যে সে বিবি সাহেবের কথা শুনে এসেছে। তিনি বললেন, 'শোন আমার স্ত্রীও আল্লাহর এক বান্দী। আমি যদি তাকে তালাক দিই

তাহলে তার অন্য কারো সাথে বিয়ে হবে এবং তাকে কষ্ট দেবে। কী দরকার আল্লাহর আরেক বান্দাকে কষ্টে ফেলার। তার চেয়ে ভালো আমিই আল্লাহর এই বান্দীর তিক্ততা সহ্য করছি। আমার বদমেজাজী স্ত্রীর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা আমাকে বুযুর্গীর নেয়ামত দান করেছেন। এখন বাঘও আমার অনুগত। আল্লাহর এই বণ্টনে আমি তুষ্ট।'

গল্পের তোহফা:

কিছু পেতে হলে কিছু বিসর্জনও দিতে হয়। বুযর্গদের জীবনে বড় হওয়ার পেছনে বড় বড় ত্যাগ লুকিয়ে থাকে; যেটা সাধারণত আমাদের নজরে পড়ে না।

সবকিছু কেনা যায় না

হযরত থানবী রহ. এর দরবারে কিছু টাকা এলো। সাথে একটা পত্র। তাতে লেখা, ছাত্রদের দিয়ে আমার জন্যে দু'আ করাবেন।

হযরত থানবী রহ. এর দরবারের নিয়ম ছিলো, হাদিয়া দিলে দু'আ চাওয়া যাবে না, আর দু'আ চাইতে হলে হাদিয়া দেয়া যাবে না।

তিনি সে লোকের টাকা গ্রহণ না করে ফেরৎ পাঠালেন। সাথে লিখে দিলেন- এখানে দু'আর কোনো দোকান নেই।

লোকটা আবার টাকা পাঠালো। এবার লিখলো, আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি দু'আ চাচ্ছি না। দয়া করে আমার টাকাটা কবুল করুন।

হযরত থানবী রহ. এবার টাকা গ্রহণ করে সে লোককে লিখে পাঠালেন, আপনার জন্যে এমনিতেই দু'আ করা হয়েছে। কিন্তু টাকা দিয়ে দু'আ চাওয়ার অধিকার আপনার নেই। দু'আ তো করা উচিৎ আপনাদের। কারণ আমরা আপনাদের টাকা গ্রহণ করে ভালো কাজে খরচ করার ব্যবস্থা করি।

গল্পের তোহফা:

মাদরাসা মসজিদ সহ দীনের যেকোনো কাজে দান করার ক্ষেত্রে দরকার হলো, পরিপূর্ণ ইখলাস। আর দান গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন, অমুখাপেক্ষিতা। আজকের সময়ে এ দুটোরই খুব অভাব।

ইংরেজ ও ইংরেজি

হযরত থানবী রহ. এর এক মুরীদ। মুফতী আব্দুল কুদ্দূস সাহেবের পিতা। নিজের এক ছেলেকে দিলেন মাদরাসায়। অন্যটাকে স্কুলে। কাজটা করার পর তার মনে হলো, বিষয়টা শায়েখকে জানানো দরকার।

যা ভাবা তাই কাজ। শায়েখের কাছে তিনি চিঠি লিখলেন, হযরত, আমার দুই ছেলে। একজনকে দীন শেখার জন্যে মাদরাসায় দিয়েছি অন্যজনকে স্কুলে।

থানবী রহ. সে চিঠির উত্তর দিলেন। লিখলেন, 'যে সন্তানকে তুমি স্কুলে দিয়েছো তার দীন ঈমানের হেফাজতের জন্যে কী ব্যবস্থা রেখেছো?'

আজকের কোনো আধুনিক মুসলিম হলে হয়তো জবাব দিতো, 'কেন? একজন মওলবী সাহেবকে তো রেখে দিয়েছি। তিনি সপ্তাহে দু'দিন এসে আমার বাচ্চাকে পড়িয়ে যান।'

কিন্তু এই ভক্ত ছিলেন হযরত থানবী রহ. এর রুচি সম্পর্কে সজাগ। তিনি এই চিঠির কোনো উত্তর দিলেন না। প্রথমে ছেলেকে স্কুল থেকে এনে মাদরাসায় ভর্তি করলেন। তারপর থানবী রহ. কে জানালেন, 'হযরত সে ছেলেকেও মাদরাসায় ভর্তি করে দিয়েছি।' জেনে খুশি হলেন হযরত থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

গল্পের তোহফা:

স্কুল-কলেজে ইংরেজি শেখা আসলে নিষেধ নয়। নিষেধ হলো সে শিক্ষা অর্জন করে ইংরেজ হয়ে যাওয়া। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই স্কুলের বেশির ভাগ শিক্ষক থাকে দীন থেকে অনেক দূরে। এর প্রভাব পড়ে শিক্ষার্থীর ওপর। এই প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে দীন ঈমান হেফাজত করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে।

অভাব যখন ধৈর্যের

শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া রহ. একবার এক যুবককে নামায পড়তে দেখলেন। সীমাহীন একাগ্রতা ও ধীর স্থিরভাবে নামায আদায় করছে। ব্যাপারটা দেখে তিনি অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন। যুবক বয়সে এমন নামায সত্যিই প্রশংসনীয়।

একটুপর যুবকের নামায শেষ হলো। মসজিদ থেকে বের হতে গিয়ে এক বৃদ্ধের সাথে তার ধাক্কা লেগে গেলো। বৃদ্ধ নিশ্চয় ইচ্ছে করে তাকে ধাক্কা দেননি। কিন্তু তারপরও সহ্য হলো না যুবকের। সে তাকে মারাত্মক একটা গালি দিয়ে বসলো।

যাকারিয়া রহ. অবাক হলেন। এমন সুন্দর নামায পড়ে যে যুবক তার ব্যবহারের এই নমুনা!। তিনি বুঝতে পারলেন, যুবক সুন্দরভাবে নামায পড়ার অনুশীলন করেছে, কিন্তু ধৈর্যের অনুশীলন করেনি।

গল্পের তোহফা:

নামায তো পড়তে হয় দিনে পাঁচবার। তুলনামূলক কম অনুশীলনেই এটা সুন্দর হয়ে যায়। কিন্তু ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয় দিনের পুরো সময়। সে জন্যে এটাকে বাগে আনতে হলে অনেক বেশি অনুশীলনের প্রয়োজন হয়।

খিচুড়ি প্রসঙ্গ

হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী রহ.। শাইখুল হিন্দ নামে যিনি পরিচিতি। সারা জীবন ইলমে ওহীর খেদমত করে গেছেন। গড়ে গেছেন অসংখ্য আলেমে দীন। পাশাপাশি তার জীবন কেটেছে বৃটিশবেনিয়াদের বিরুদ্ধে আন্দোলন আর সংগ্রামে। জীবনের বিশাল একটা সময় কাটিয়েছেন বন্দী হয়ে।

তার মৃত্যুর পর এক লোক তাকে স্বপ্নে দেখলো। বললো, হযরত, আল্লাহ আপনার সাথে কী মু'আমালা করেছেন?

শাইখুল হিন্দ রহ. জবাবে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নাজাত দিয়েছেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, সারা জীবনের খেদমত আর আন্দোলন কোনোটাই আমার নাজাতের সময় আলোচনায় আসেনি। আলোচনায় এসেছে আমার পারিবারিক জীবনের ছোট্ট একটি ঘটনা।

একদিন আমার স্ত্রী খিচুড়ীতে লবণ কম দিয়েছিলো। কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমি সেদিন হাসিমুখে সে খিচুড়ি খেয়ে নিয়েছিলাম। স্ত্রীকে কিছুই বলিনি। এ কাজকে পছন্দ করে আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাফ করে দিয়েছেন।

গল্পের তোহফা:

জীবনে চলার পথে আমরা ছোটখাট অনেক ভালো বিষয়কে তুচ্ছ মনে করে ছুড়ে ফেলি। অথচ দিন শেষে সেটাই হতে পারে আমাদের জন্যে মহা দরকারী, নাজাতের উসীলা।

darsemansoor.com Install Islami Jindegi App islamijindegi.com

বিশ্বজোড়া পাঠশালা

গওহরডাঙ্গা মাদরাসার এক বালক। মীযান বা নাহবেমীরে পড়ে। সে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। তখন মাদরাসায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিলো না। রাতের বেলা কেরোসিনের আলোতে চলতো পড়াশোনা। প্রত্যেক ছাত্রের ছিলো আলাদা আলাদা কুপি বা হারিকেন। ছাত্ররা নিজ খরচে তেল কিনে সেগুলো জ্বালাতো। তেল শেষ হয়ে এলে আগেভাগেই তেল কিনে রাখতো।

এই ছেলেটিরও একবার কেরোসিন ফুরিয়ে এলো। কেরোসিন কিনতে যেতে হবে শহরে। বাধ্য হয়েই ছেলেটি শহরে গেলো। যে দোকান থেকে কেরোসিন কিনতে হবে সেটা ছিলো এক হিন্দুর দোকান। ছেলেটি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, দোকানের একটি দর্শনীয় স্থানে লেখা-

‘চলবে কিসে ভাবছো মিছে, তুমি ভাববার কে?
যার ভাবনা ভাবছেন তিনি, তুমি ভাবো তাকে।’

লাইন দু’টি রেখাপাত করলো ছেলেটির মনে। তাইতো আমি বড় হয়ে কিভাবে উপার্জন করবো, কিভাবে খাবো আর কিভাবে চলবো, এসব তো নিতান্তই মিছে ভাবনা। এসব ভাবার মালিক তো আল্লাহ তা‘আলা। আমার কাজ হলো ইলম অর্জন করে তাঁকে ভাবতে শেখা আর তাঁর দীনের জন্যে কাজ করে যাওয়া।

ভাবুক ছেলে কেরোসিন কিনে ফিরে এলো মাদরাসায়। হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে রইলো দু’টি লাইন। এ দু’লাইনের শিক্ষাকে নিজের সারা জীবনে প্রতিফলিত করার জন্যে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

ছেলেটি সত্যিই তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পেরেছে। জীবনের বহু চড়াই উৎরাই পাড়ি দিয়ে সেই ছেলেটি আজ আমাদের সামনে মুফতী মনসূরুল হক দামাত বারাকাতুহুম হিসেবে জ্বলজ্বল করছেন।

গল্পের তোহফা:

বড় হতে হলে সব কিছু থেকেই সবক হাসিল করতে হয়। পুরো বিশ্বকে নিজের পাঠশালা বানিয়ে সেখান থেকে প্রয়োজন মাফিক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও সবক হাসিল করতে হয়।

সহজ সংশোধন

গল্পটা গওহরডাঙ্গা মাদরাসার। বর্তমানে এটা গোপালগঞ্জ জেলায়। সে সময়ে এ মাদরাসা বৃহত্তর ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এ মাদরাসাতেই এক সময় লেখাপড়া করেছেন বর্তমানের নন্দিত আলেমে দীন, মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম।

মুফতী সাহেব হুজুর তখন মাধ্যমিক কোন এক শ্রেণীতে পড়েন। মাদরাসার জমিনে লাউ গাছ লাগানো হয়েছিলো। এক সময় লাউয়ে ভরে উঠলো মাচা। এখন এগুলো পেড়ে ফেলার সময় হয়েছে। মাদরাসার ছাত্ররা আনন্দের সাথে কাজ করতে তৈরী হয়ে গেলো। কাজে নেমে তারা দু'ভাগে ভাগ হয়ে হলো। একটা দল গাছ থেকে লাউগুলো আলাদা করতে লাগলো। অন্যরা সেগুলো এনে জমা করতে লাগলো মাদরাসার আঙ্গিনায়।

একজন উস্তাদ মাদরাসার গেটে দাঁড়িয়ে পুরো অবস্থা দেখছিলেন। কী চমৎকার এ দৃশ্য। ছাত্ররা লাইন বেঁধে আসছে। প্রত্যেকের দুই হাতে দুটো করে লাউ। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো এক ছাত্রের ওপর। তার এক হাতে একটি লাউ। অন্য হাতটা খালি। অথচ লাউগুলোর যে ওজন, তাতে দুই হাতে দু'টা অনায়াসেই আনা যায়।

উস্তাদ কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। বুঝতে পারলেন, অলসতার কারণেই ছেলেটা এমন করছে। এরকম ক্ষুদ্র বিষয়ের অলসতাই এক সময় তাকে বড় অলস করে তুলতে পারে। উস্তাদজী চাইলেন, ছেলেটার মধ্যকার অলসতা অঙ্কুরেই উৎপাটিত হোক। অলসতার প্রতি ওর ঘৃণা সৃষ্টি হোক জীবনের শুরু থেকেই।

এসব ভেবে তিনি মুচকি হেসে সেই ছাত্রকে লক্ষ্য করে বললেন, 'একি, তুমি তো দেখছি মাশাআল্লাহ পুরো লাউটাই নিয়ে এসেছ!'

darsemansoor.com Install Islami Jindegi App islamijindegi.com

উস্তাদের এ কথায় চমৎকার কাজ হলো। ছাত্রটি তার হাতের লাউটা রেখেই ছুটলো। দুটো করে লাউ আনতে হবে। কাজের গতিও বাড়াতে হবে। এতক্ষণের কাযা কিছুটা হলেও যদি আদায় করা যায়!

গল্পের তোহফা:

সহজ সংশোধনই আসলে গ্রহণযোগ্য ও বেশি ফলপ্রসু। সুতরাং সহজভাবে যদি কাউকে সংশোধন করা সম্ভব হয় তাহলে অযথা কঠোরতা করা বোকামী।

বড়র হাতে হাত

এক.

মুফতী সাহেবের বাড়ি। খুলনার পাইকগাছা থানার কমলাপুর গ্রাম। হুজুরের বাড়ির সামনে তো এখন পিচঢালা চকচকে হাইওয়ে। কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি তখন এ রাস্তা ছিল শুধুই মাটির। বর্ষাকালে তা হয়ে উঠতো পিচ্ছিল ও বিপদশঙ্কুল। পা টিপে টিপে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাঁটতে হতো। একটু এদিক ওদিক হলেই সেরেছে।

একবার হুজুরের সাথে পাইকগাছা বেড়াতে গেছেন রাহমানিয়ার বর্তমান উস্তাদ মাওলানা উবাইদুল্লাহ হাজারী সাহেব দা.বা.। সে সময়ে তিনি ছোট। বয়স বড়জোর চৌদ্দ পনের। রাহমানিয়ারই ছাত্র।

তখন বর্ষাকাল। মাটির রাস্তা যথারীতি পিচ্ছিল। সেখান থেকে ফেরার সময় মুফতী সাহেব হাজারী সাহেবের হাত ধরে পা টিপে টিপে হাঁটছিলেন। কিন্তু পনের বছরের দূরন্ত বালকের জন্যে তো এমন ধীর লয়ের হাঁটা সহ্য হওয়ার কথা না। হাজারী সাহেব তাই মুফতী সাহেবের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠছিলেন।

কিছুক্ষণ পর। পিচ্ছিল রাস্তার পরিমাণ কিছুটা কমে এসেছে। মুফতী সাহেব হাজারী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী, হাত ছেড়ে চলতে পারবে?’

হাজারী সাহেব তো অপেক্ষাতেই ছিলেন। জোরে মাথা নেড়ে বললেন, ‘হ্যাঁ, পারবো।

বালকের ইচ্ছে পূরণে মুফতী সাহেব তার হাত ছেড়ে দিলেন। হাজারী সাহেব মনের আনন্দে ধাই ধাই করে সামনে এগিয়ে

গেলেন। কিন্তু খুব সামান্যই। কয়েক কদম এগিয়েই ধপাস। সারা গা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেলো।

মুফতী সাহেব পাশের এক পুকুর থেকে তাকে পরিস্কার করলেন। বাকী পথটুকু তার হাত প্রচণ্ডভাবে আকড়ে রাখলেন হাজারী সাহেব।

দুই.

হযরত শেখ সাদী রহ. তখন ছোটো। একবার তার পিতার সাথে বাজারে গেছেন। বাজারের ভীড়ে প্রবেশের আগে তার পিতা বললেন, 'আমার হাত কিন্তু কিছুতেই ছাড়বে না'।

ভীড়ের মধ্যে এক পর্যায়ে ছোট্ট সাদী অজান্তেই তার পিতার হাত ছেড়ে দিলেন। হারিয়ে গেলেন জনসমুদ্রে। কাঁদতে কাঁদতে এদিক সেদিক ঘুরতে লাগলেন।

দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর তার পিতা তাকে পেয়ে এক ধমক লাগালেন। বললেন, 'বলেছিলাম না, আমার হাত ছাড়বে না।"

গল্পের তোহফা:

সাধারণ শিশুদের জন্যে তো এটা শুধুই ধমক। কিন্তু পিতার ধমক এবং এ ঘটনা থেকে শেখ সাদী বিরাট শিক্ষা গ্রহণ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, 'পিতার হাতে হাত না থাকলে যেমন মানুষ দিক ভুলে হারিয়ে যায়, ঠিক তেমনি কোন কামেল শাইখের হাত না ধরে থাকলেও তাকে জীবনের খেলা ঘরে পদে পদে হোচট খেতে হয়।

সঙ্গ গুণ

হযরত হারদুয়ীর দরবার। শৃঙ্খলা আর বিন্যাসের তুলনাহীন নিকেতন। এই দরবারে আগমনকারীদের প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করা হয়। ভুলগুলো শুধরে দেয়া হয় স্পষ্ট ভাষায়।

হারদুয়ীর হযরত তখন হায়াতে। একবার তার কাছে গেলেন মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশের আমীর মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব দা.বা.। মাওলানা যখন সেখানে পৌঁছলেন আবরারুল হক রহ. সাক্ষাতের কামরায় ছিলেন না।

অপেক্ষা করতে লাগলেন মাহমূদুল হাসান সাহেব। শায়েখের সাক্ষাত আকাঙ্ক্ষায় কিছুটা অস্থির। কাঁধের রুমালটা পাশেই রেখেছেন।

এমন সময় হারদুয়ীর হযরত প্রবেশ করলেন কামরায়। হযরতকে দেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন মাহমূদুল হাসান সাহেব। পাশে রাখা রুমালটা তুলতে ভুলে গেলেন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন আবরারুল হক সাহেব। বললেন, 'এটা কি রুমাল রাখার কোনো জায়গা হলো? হয় কাঁধে রাখো, না হয় কাপড় রাখার স্ট্যান্ড আছে সেখানে রাখো।'

গল্পের তোহফা:

সত্যি, আমাদের চোখে যা নির্ভুল একজন মুসলিহ সংস্কারকের চোখে তাই নিরেট ভুলে প্রতিপন্ন হয়। জীবনে চলার পথে যেসব ভুল নিতান্তই অভ্যাসবসে হয়ে যায় সেগুলোও শায়েখের সংস্পর্শে একে একে শোধরাতে থাকে। জীবন এগিয়ে চলে আলোকিত পথের দিকে...।

রঙ ধরবার জন্যে...

সেবার মুফতী সাহেব গেছেন হারদুয়ীতে। সাথে জামি'আ রাহমানিয়ার মুহতামিম মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেব দা.বা.। পৌঁছার পর হারদূয়ী হযরত তাদের বললেন, আপনাদের ইখতিয়ার। ইচ্ছে করলে মেহমানখানায় থাকতে পারেন আবার কুতুবখানায়ও থাকতে পারেন।

তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে কুতুবখানায় থাকাকে ভালো মনে করে সেখানে ঢুকে পড়লেন। ভাবলেন, যাক থাকার ব্যাপারটা তাহলে নিষ্পত্তি হয়ে গেলো। এবার অন্যান্য ফিকির করা যায়।

কিন্তু না ব্যাপারটা শেষ হয়নি। হযরতের কাছে সংবাদ গেলো ঢাকার মেহমানরা কুতুবখানায় ঢুকেছেন। তিনি তাঁদেরকে ডাকালেন। নিজেদের খেয়াল খুশি মতো কুতুবখানায় ঢুকে পড়ার বিষয়ে কৈফিয়ত চাইলেন। হযরতের কথায় মুফতী সাহেব এবং হিফযুর রহমান সাহেব একেবারে জড়োসড়ো হয়ে গেলেন। বুঝতেই পারছেন না- কী ভুল হয়ে গেছে। হযরত নিজেই তো কুতুবখানা ও মেহমানখানার যে কোন একটায় থাকার ইখতিয়ার আমাদের দিয়েছিলেন। এখন আবার হযরত কৈফিয়ত চাইছেন! মুফতী সাহেব এবং হিফযুর রহমান সাহেব খুবই আশ্চর্য হলেন। কিন্তু কিছুই না বলে হযরতের সামনে আদবের সাথে বসে রইলেন।

হারদুয়ী হযরত বুঝতে পারলেন। তাই বিষয়টা তাদের সামনে স্পষ্ট করলেন। বললেন, 'আপনাদেরকে আমি দুই কক্ষের যেকোনো একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিয়েছিলাম, ঠিক আছে। কিন্তু উচিৎ ছিলো, ইখতিয়ার পাওয়ার পর আপনারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবেন। এরপর আমাকে জানাবেন যে, আমরা দুই কামরার মধ্যে

এটাকে গ্রহণ করেছি। এরপর আমি যখন সে কামরায় থাকার অনুমতি দেব তখন মাল-সামানা নিয়ে আপনারা সেখানে যাবেন। এটাই ছিলো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তা না করে নিজেরাই একটাতে ঢুকে পড়লেন। এটা কি ঠিক হলো?'

গল্পের তোহফা:

এভাবেই হারদুয়ী হযরত তাঁর দরবারে আগত মেহমানদের প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ করতেন। প্রতিটি নড়াচড়া দেখে নির্ধারণ করতেন রোগ। আর সে অনুযায়ী দিতেন রুহানী প্রেসক্রিপশন, আত্মশুদ্ধির পথনির্দেশ।

শেখার আছে অনেক কিছু

হযরত হারদূয়ী রহ. -এর দরবারের সাথে পাঠক তো ইতোমধ্যে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর মজলিসে চা পরিবেশনের নিয়মটা ছিলো খুবই চমৎকার। প্রথমে সবার কাছে চায়ের কাপ পৌঁছে যেত। এরপর আসত কেটলিভর্তি গরম পনি। তারপর টি ব্যাগ আর চিনি। সবাই নিজের প্রয়োজনমতো সবকিছু নিয়ে নিত।

মাঝে মাঝে হারদূয়ীর হযরত তাঁর কাছে আগত ইসলাহপ্রার্থীদের দিয়েও এসব খেদমত নিতেন। উদ্দেশ্য, ছোটখাট প্রত্যেকটা বিষয়ে তাদের সংশোধন করা।

সেবার মুফতী মনসূরুল হক সাহেব ছিলেন হযরতের দরবারে। নাস্তার পর চায়ের সরঞ্জাম বিতরণের পর্ব এলো। হযরত দায়িত্ব দিলেন মনসূরুল হক সাহেবকে। আদেশ পেয়েই কাপ বিতরণ শুরু করলেন তিনি।

হারদূয়ীর হযরত তাকিয়ে আছেন তার দিকে। দেখছেন কাপ বিতরণের দৃশ্য। কয়েকটা কাপ বিতরণের পরই তাকে থামিয়ে দিলেন হযরত। বললেন, ‘আরে, আপনিতো দেখছি চায়ের কাপও বণ্টন করতে পারেন না!

হযরতের কথা শুনে থমকে গেলেন মুফতী সাহেব। বাহ্যিকভাবে তো সব ঠিকই মনে হচ্ছে। শুরু করা হয়েছে ডান দিক থেকেই। অন্যান্য আদবের প্রতিও লক্ষ রাখা হয়েছে যথাসাধ্য। তাহলে ভুলটা হলো কোথায়?

হারদূয়ীর হযরত বললেন, ‘ দেখুন, আপনার হাতের ট্রেতে রাখা সবগুলো কাপ কিন্তু একরকম না। এর মধ্যে কিছু আছে অনেক আগের কেনা। বেশ পুরনো হয়ে গেছে। কিছু আছে মাঝারী মানের। আর কিছু একেবারে নতুন।

এখন আপনি যদি কোন রকম বাছ বিচার না করে বিতরণ করতে থাকেন, তাহলে কেউ হয়তো পাবে নতুনটা, আবার তার পরের জনই পাবে পুরনোটা। পুরানোটা যে পাবে সে মনে করতে পারে, আপনি ইচ্ছে করে তাকে অপমান করেছেন। ট্রেতে নতুন কাপ থাকা সত্ত্বেও তাকে পুরানোটা দিয়েছেন।

তাই আপনার উচিৎ ছিলো, সবচে' নতুন কাপগুলো সর্বপ্রথম বিতরণ করে ফেলা। নতুন কাপ যারা পাবে তারা নিশ্চয়ই মন খারাপ করবে না।

এরপর মাঝারী মানের কাপগুলো বিতরণ করা। এদেরও মন খরাপ করার সুযোগ নেই। কারণ, নতুন কাপ ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে।

সবশেষে পুরানো কাপগুলো বিতরণ করা। এখন আর কেউ এই ধারণা করতে পারবে না যে, আপনি ইচ্ছে করে তাকে পুরানো কাপ দিয়েছেন। এখনতো বাকী আছেই পুরানোগুলো। চা পান করতে হলে তাকে পুরানোটাই নিতে হবে।'

গল্পের তোহফা:

হারদূয়ী হযরতের কথা শুনে আনন্দে মুফতী সাহেবের চোখে পানি চলে এলো। চায়ের কাপ বিতরণ করার মতো একটা বিষয়! ব্যাপারটাকে অনেকে হয়তো খুবই সাধারণ মনে করবে। কিন্তু এই একটা আদব শেখার জন্যেও তাকে আসতে হয়েছে একজন কামেল পীরের দরবারে।

এই সফরে তার খরচ হয়েছে প্রায় বিশ হাজার টাকা। এখন মনে হচ্ছে, বিশ হাজার টাকা ব্যয়ের এমন প্রতিটা সফরে যদি এমন একটি শিক্ষাও অর্জন হয়; তবু সেটা হবে সামান্য ত্যাগে বিরাট

প্রাপ্তি। কারণ, এসব শিক্ষা কখনই অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায় না। কিনতে হয় হৃদয়ের দামে।

বেঁচে থাকা ইতিহাস

ত্যাগ মহিয়ান

মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই সন্তান প্রিয়। সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা তার মনের মধ্যে বিরাজ করে। যারা দীর্ঘদিন নিঃসন্তান থাকে তাদের তো এই বাসনা ক্রমেই তীব্র হতে থাকে।

হযরত ইবরাহীম আ. ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে নেক সন্তান দান করুন।'

মহান আল্লাহ দু'আ কবুল করলেন। ইবরাহীম আ. কে সুসংবাদ দিলেন, তোমাকে একজন ছেলে দেয়া হবে। যে হবে বুদ্ধিমান। স্ত্রী হাজেরার কোল আলোকিত করে জন্ম নিলেন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম।

সব পিতারাই ছেলে সন্তান নিয়ে স্বপ্ন বোনেন। ছেলে বড় হবে। সব কাজে তার সহযোগিতা করবে, এই রকম হাজারো স্বপ্ন চোখের তারায় ভাসে। শিশু ইসমাঈল ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন। এক সময় তিনি পিতার সাথে চলাফেরার উপযুক্ত হলেন। ছোটখাট কাজে তাকে সাহায্য করার সামর্থ্য অর্জন করলেন।

এমন সময় পিতা ইবরাহীম দেখলেন অদ্ভুত এক স্বপ্ন। স্বপ্নে তাকে বলা হচ্ছে, তুমি তোমার প্রিয় বস্তু কুরবানী করো। পর পর তিন দিন দেখলেন এই স্বপ্ন। প্রতিদিনই তিনি একশ' করে উট, দুম্বা কুরবানী করলেন।

কিন্তু তারপরও একই স্বপ্ন। ইবরাহীম আ. চিন্তায় পড়ে গেলেন। প্রিয় বস্তু বলতে কী বুঝানো হচ্ছে? এক সময় বুঝতে পারলেন। হ্যাঁ তাইতো, ইসমাঈলই তো তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। তার মানে তাকেই কুরবানী করতে বলা হচ্ছে?

ইবরাহীম আ. মনস্থির করে ফেললেন ইসমাঈলকে আল্লাহর জন্যে কুরবানী করবেন। কিন্তু তার আগে তো ইসমাঈলের মতামতটাও জানা দরকার।

তিনি ছেলেকে বললেন, বেটা, আমি স্বপ্নে দেখলাম তোমাকে কুরবানী করছি। বলো বেটা, তোমার মত কী? ইসমাঈলের তখন কতই বা বয়স। বারো কিংবা তেরো। সবে মাত্র কৈশরে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু তার কথায় প্রকাশ পেল পরিণত বুদ্ধির আভা। তিনি বললেন, শ্রদ্ধেয় পিতা, আপনি নিশ্চিন্তে এ আদেশ বাস্তবায়ন করুন। আল্লাহর আদেশের সামনে আমাকে পরিপূর্ণ ধৈর্যধারণকারী পাবেন। পিতা পুত্রের কি চমৎকার মিল। পিতা স্বপ্নে আদেশ পেলেন। সে আদেশ পালনে তিনি দৃঢ়বদ্ধ।

আর ছেলে প্রদর্শন করলো বিনয় ও বশ্যতার চরম পরাকাষ্ঠা। এই আদেশের যৌক্তিকতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন না করে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিলো।

পিতা-পুত্র রওয়ানা হলেন কুরবানী স্থলে। শয়তানও বসে থাকলো না। এক এক করে তিন বার পিতা-পুত্রকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করলো। তিনবারই ইবরাহীম আ. তাকে কংকর মেরে তাড়িয়ে দিলেন।

শয়তানের প্রতারণা উপেক্ষা করে তারা পৌঁছে গেলেন কুরবানী স্থলে। কুরবানীর জন্যে প্রস্তুত হলেন। ছেলেকে শুইয়ে চালিয়ে দিলেন ছুরি।

ইবরাহীম আ. ছুরি চালাচ্ছেন সজোরে। কিন্তু গলা কাটছে না। ব্যাপার কী? ইসমাঈল বললেন, ‘পিতা, আমার চেহারা দেখার কারনে হয়তো আপনার স্নেহ উথলে উঠছে। আপনি পূর্ণ শক্তি

প্রয়োগ করতে পারছেন না। আমাকে উপুড় করে শুইয়ে দিন।' ছেলের কথা অনুযায়ী তাকে উপুড় করে ছুরি চালালেন পিতা।

কিন্তু ততক্ষণে পিতা-পুত্রের অগ্নি পরীক্ষা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ত্যাগের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উভয়ে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। সে মুহূর্তেই আকাশ থেকে আওয়াজ এলো, হে ইবরাহীম, নিশ্চয়ই আপনি আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে ত্রুটিহীনভাবে চেষ্টা করেছেন।

ইবরাহীম আ. আওয়াজ শুনে তাকালেন। জিবরাঈল আ. এসেছেন। সাথে একটি দুম্বা। আল্লাহ তা'আলার পাঠানো সুন্দর এই বেহেশতী দুম্বা ইসমাঈলের পরিবর্তে কুরবানী করা হলো।

গল্পের তোহফা:

১. আল্লাহর যেকোনো আদেশের সামনে নিজেকে সম্পূর্ণ নত করে দিতে হবে।

২. দীনের খেদমতে যেকোনো আহ্বান শোনা মাত্রই লাব্বাইক বলতে হবে।

৩. শত কষ্ট-মুসিবতেও দীনের পথে অটল ও অবিচল থাকতে হবে।

৪. দীন-দুনিয়ার সকল কাজে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, বান্দার কাজ হচ্ছে চেষ্টা করা; সাহায্য ও ফলাফল একমাত্র আল্লাহর হাতে।

কপালপোড়া

এক.

লোকটার নাম ছিলো উমাইয়া ইবনে খালফ। ডাক নাম আবু সফওয়ান। মক্কার কাফেরদের একটা কবিলার সর্দার।

মদীনার অধীবাসী একজন সাহাবী ছিলেন হযরত সা'দ ইবনে মু'আজ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। ইসলাম গ্রহণের আগে থেকেই উমাইয়া ইবনে খালফের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিলো। উমাইয়া যখন মদীনায় যেতো, সা'দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বাড়িতে উঠতো। আর সা'দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কোন কাজে মক্কায় এলে উমাইয়ার বাড়িতে উঠতেন।

হিজরতের পরের কথা। হযরত সা'দ ইবনে মু'আজ উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় এলেন। যথারীতি উঠলেন উমাইয়ার বাড়িতে। সা'দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে বললেন, আমার তাওয়াফের জন্যে নিরাপদ ও নিরিবিলি একটা সময় বের করো। উমাইয়া হযরত সা'দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নিয়ে মধ্য দুপুরে বের হলো।

হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আবু জাহলের সাথে। সে বললো, হে আবু সফওয়ান, তোমার সাথে এটা কে ? উমাইয়া বললো, এ হলো সা'দ। এবার আবু জাহল তাকালো সা'দ ইবনে মু'আজের দিকে। বললো, 'আর্শ্চয! তোমরা পূর্বপুরুষের ধর্ম থেকে বিচ্যুত একটা গোষ্ঠিকে সাহায্য করার নামে তোমাদের শহর মদীনায় আশ্রয় দিয়েছ। এরপরও মক্কায় এসে খুব নিরাপদ ভাবে নিশ্চিন্তেই তাওয়াফ করছ! খোদার কসম, যদি তোমার সাথে আবু সফওয়ান না থাকতো, নিজের পরিবারের কাছে তুমি সহি সালেম ফিরে যেতে পারতে না।'

আবু জাহলের আওয়াজের ওপর আওয়াজ উঁচু করে সা'দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, 'আরে, তুমি যদি আজ আমাকে তাওয়াফ করতে বাধা দিতে, তাহলে আমি তোমার জন্যে মদীনা হয়ে সিরিয়ায় যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিতাম।'

সা'দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এ কথা শুনে উমাইয়া মনে মনে পেরেশান হয়ে উঠলো। না জানি সা'দের একথায় আবু জাহল আবার তার ওপর রাগ করে বসে! সে সা'দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বললো, সা'দ! আমাদের সর্দার আবুল হাকামের সাথে উঁচু আওয়াজে কথা বলো না।'

উমাইয়ার এ উপদেশ এক ঝটকায় উড়িয়ে দিলেন হযরত সা'দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। বললেন, রাখো তোমার উপদেশ। খোদার কসম, আমি নবীজীকে বলতে শুনেছি, তিনি তোমাকে হত্যা করবেন।

এ কথা শুনে উমাইয়া আবু জাহলের উপস্থিতির কথা বেমালুম ভুলে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথার ওপর তার বিশ্বাস ছিলো। তাই সে সা'দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, মুহাম্মাদ আমাকে কোথায় হত্যা করবে, মক্কায়? সা'দ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, 'তা জানি না।'

ঘরে ফিরে উমাইয়া তার স্ত্রীকে সব খুলে বললো। হত্যার স্থান সম্পর্কে সা'দের কাছ থেকে কিছু জানতে না পারলেও উমাইয়া বললো, আমি আর কিছুতেই মক্কা থেকে বের হবো না।

বদরের যুদ্ধের সময়। নিজেদের ব্যবসায়ী কাফেলাকে রক্ষা করার জন্যে আবু জাহল বের হলো বাহিনী যোগাড় করতে। উমাইয়ার কাছেও সে এলো। উমাইয়া রাজি হচ্ছিলো না। তার মনে হচ্ছিলো,

মক্কা থেকে বের হলেই সে মৃত্যুর মুখে পতিত হবে। আবু জাহল বললো, ‘আবু সফওয়ান, তুমি মক্কার সর্দারস্থানীয় লোক। তুমি যদি হাল ছেড়ে দাও অন্যরাও পিছিয়ে যাবে।

আবু জাহলের পীড়াপীড়িতে উমাইয়া রাজি হলো। কিন্তু সে মনে মনে ঠিক করলো, মক্কার সর্বোৎকৃষ্ট উট কিনবে। যেন সুযোগ পেলেই ভেগে আসা যায়।

উমাইয়া তার স্ত্রীকে বললো, আমার যুদ্ধসামগ্রী তৈরি করে দাও। স্ত্রী তাকে ভবিষ্যৎবাণীর কথা মনে করিয়ে দিলো। বললো, তুমি কি তোমার মদীনার ভাইয়ের কথা ভুলে গেছ? উমাইয়া বললো, সে কথা কি ভোলা যায়? আমি তো কিছুদূর গিয়েই ফিরে আসব।

কাফিরদের বাহিনী রওয়ানা হলো। পথে যেখানেই কাফেলা থামলো, উমাইয়া নিজের বাহনটাকে মাথার কাছে বেঁধে রাখলো। সুযোগ খুঁজতে লাগলো চলে আসার। কিন্তু একবারের জন্যেও সুযোগ এলো না। বাহিনী পৌঁছে গেলো বদর প্রাঙ্গনে।

উমাইয়ার আর ফেরা হলো না মক্কায়। বদর প্রাঙ্গনেই জীবনলীলা সাঙ্গ হলো তার। পোড়া কপালে সারা জীবনের জন্যে এঁটে গেলো বঞ্চনার চিহ্ন।

দুই.

আরেক কমবখতের নাম ছিলো উবাই ইবনে খালফ। সে একটা ঘোড়া পালতো। সেটাকে আদর-যত্ন করে অনেক কিছু খাওয়াত। হিজরতের আগে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতো, এ ঘোড়ায় চড়ে আমি তোমাকে হত্যা করব।

কত বড় ধৃষ্টতা! সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার হুমকি! নাউযুবিল্লাহ। নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, ইনশাআল্লাহ আমিই তোমাকে হত্যা করব।

উহুদের যুদ্ধে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হন্যে হয়ে খুঁজছিলো। বলছিলো, 'আজ যদি তিনি বেঁচে যান তবে আমার আর রক্ষা নেই।' একসময় সে নবীজীকে পেয়ে গেলো।

সাহাবায়ে কিরাম চাচ্ছিলেন দূর থেকেই তাকে শেষ করে দিতে। নবীজী বললেন, 'তাকে আমার কাছে আসতে দাও।' কাছে এসে সে নবীজীর ওপর হামলা করার প্রস্তুতি নিলো। নবীজী হযরত হারিস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কাছ থেকে একটা বর্শা নিয়ে তার দিকে নিক্ষেপ করলেন। বর্শা তার ঘাড়ে শুধু একটা আঁচড় তৈরি করলো।

এ সামান্য আঘাত পেয়েই সে পালাবার পথ খুঁজতে লাগলো। পালাবার সময় সে কয়েকবার ঘোড়া থেকে পড়ে গেলো। ষাড়ের মতো চিৎকার করে বলতে লাগলো, মুহাম্মদ আমাকে শেষ করে ফেলেছে।

দলের কাফেররা তাকে সান্তনা দিয়ে বললো, এটাতো সামান্য আঁচরমাত্র। চিন্তার কিছু নেই। সে বললো, 'মক্কায় থাকতে মুহাম্মাদ বলেছিলো, আমি তোমাকে কতল করব। আজ যদি সে আমার দিকে থুথুও নিক্ষেপ করতো, আমি মারা যেতাম।'

আবু সুফিয়ান তাকে লজ্জা দিয়ে বললো, 'এই সামান্য আঘাতে এতো চিৎকার করছ?' উবাই ইবনে খালফ বললো, লাত উজ্জার কসম, আমার এই যন্ত্রনা যদি পুরো হিজাযবাসীকে ভাগ করে দেয়া হয়, সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে!

মারাত্মক এই যন্ত্রনা পিছু ছাড়লো না তার। মুশরিক বাহিনীর সাথে মক্কার পৌঁছার একদিন আগে পথেই এই কপালপোড়া মৃত্যুর মুখে পতিত হলো।

গল্পের তোহফা:

রাহমাতুল্লিল আলামীনের আঘাতে নিহত। এরচেয়ে কপালপোড়া আর কে আছে? নিজেদের কৃতকর্মই এদের অতিদ্রুত লাঞ্চনার দিকে টেনে নিয়েছে।

কাবেল ও মাকবুল

কাবেল ও মাকবুল। পাশাপাশি দুটি শব্দ। কাবেল শব্দের অর্থ যোগ্য। আর মাকবুল শব্দের অর্থ করা যায় গ্রহণযোগ্য। বাহ্যিকভাবে দিক থেকে শব্দ দু'টি কাছাকাছি হলেও দুটোর অর্থে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। একটা মানুষ কাবেলিয়্যাত অর্জন করেছে মানে হলো, তার মধ্যে কাজ করার যোগ্যতা তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেই যোগ্যতা কাজে লেগেছে কিনা সে কথার উল্লেখ কিন্তু কাবেলিয়্যাত শব্দে নেই।

এর বিপরীতে কারো অর্জিত যোগ্যতা যখন কাজে লেগে যায়। যোগ্যতা যেমনই থাকুক না কেন, সেটা যখন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়, তখন সে মাকবুল হিসাবে বিবেচিত হয়।

এজন্যেই দেখা যায় অনেক কাবেল মানুষ মাকবুল না হওয়ার কারণে তাকে দিয়ে কোন কাজ হচ্ছে না। আবার অনেক সাধারণ মানুষও মাকবুল হওয়ার কারণে তার মাধ্যমে আল্লাহ অনেক কাজ নিচ্ছেন। এ থেকে বোঝা যায়, কাবেলিয়্যাত তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন মাকবুলিয়্যাতের।

হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. সাধারণত নিজের ক্লাসে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতেন। প্রথম স্থান অধিকার করতেন চিটাগাংয়ের এক আলেম। কিন্তু পরবর্তীতে যখন আনওয়ার শাহ রহ. দেওবন্দের শাইখুল হাদীস হলেন। সেই প্রথম স্থান অধিকারী ব্যক্তি বসলেন তাঁর দরসে। দরসে উলুম ও ফুনুনের এমন স্রোত বয়ে গেলো যে, সেই নম্বরে আউয়াল মানুষটিরও বুঝতে কষ্ট হয়ে গেলো।

খোদার রহম বাহানা খোঁজে

দারুল উলুম দেওবন্দ। যেখানে ভর্তি হওয়ার জন্যে ছাত্ররা নিজেদের রাতদিন এক করে ফেলে। প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্র পরীক্ষা দিয়ে সুযোগ পায় কয়েক শ'। সেখানে ভর্তি পরীক্ষা চলছে। দু'জন উস্তাদ মৌখিক পরীক্ষা নিচ্ছেন। ভর্তিচ্ছু এক ছাত্রকে প্রশ্ন করা হলো, الحمد لوليه - এর মধ্যে واو টা কোন واو

ছাত্র উত্তর দিলো, واو عاطفة

প্রধান পরীক্ষক তাকে পাশ নম্বর দিয়ে দিলেন।

সহকারী পরীক্ষক তাকে বললেন, 'হুজুর, তার উত্তর তো সঠিক হয়নি। এরপরও তাকে নম্বর দিয়ে দিলেন যে!

হুজুর উত্তর দিলেন, 'ছেলেটার উত্তরে কমপক্ষে এতটুকু তো বুঝা গেলো যে, সে নাহু পড়েছে। তা না হয় সে واو عاطفة -এর কথা কিভাবে বললো?'

গল্পের তোহফা:

সামান্য এক বাহানায় এ তালেবে ইলমের ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে গেলো। আল্লাহর রহমত তো শুধু বাহানা খোঁজে। কখন কীভাবে মিলে যাবে, কে জানে?

সবার জন্যে পাগড়ি

প্রায় তিন দশক আগের কথা। সে সময় বাংলাদেশের বড় বড় মাহফিলে ওয়াজ করার জন্যে দাওয়াত দেয়া হতো মাওলানা আব্দুল্লাহ দরখাস্তী সাহেবকে। এদেশের মানুষকে দীনের কথা শোনাতে সুদূর পাকিস্তান থেকে তিনি আসতেন।

একবারের ঘটনা। কোন এক মাদরাসার ফারেগীন ছাত্রদের পাগড়ি প্রদান করা হবে। এ উপলক্ষে আয়োজিত মাহফিলে তাকে দাওয়াত দেয়া হলো। সাধারণত সব মাদরাসাতেই দাওরায়ে হাদীস সমাপনকারী ছাত্রদেরকে সম্মান প্রকাশ ও দায়িত্বের অনুভূতি সৃষ্টির জন্যে পাগড়ি প্রদান করা হয়।

সে মাহফিলে মাওলানা আব্দুল্লাহ দরখাস্তী সাহেব প্রাসঙ্গিক বয়ান শেষে ছাত্রদের মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দিতে লাগলেন। এমন সময় কয়েকজন সাধারণ শ্রোতা দাবী করে বসলো, তাদেরকেও পাগড়ি দিতে হবে। তাদের যুক্তি হলো, ‘এই পাগড়ি হলো বরকতের পাগড়ি। এ বরকত থেকে আমরাও বঞ্চিত হতে চাই না।’ এ কথা শুনে অন্যরাও উৎসাহী হয়ে উঠলো। সবাই পাগড়ি পাওয়ার দাবী করতে লাগলো।

মাওলানা আব্দুল্লাহ দরখাস্তী সাহেব চাইলে জনসাধারণের দাবী সহজেই উড়িয়ে দিতে পারতেন। এ মাহফিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করে তাদের এ দাবীর অসারতা খুব মজবুতভাবেই প্রমাণ করতে পারতেন।

আর এমন কিছু তিনি করলে সেটা হতো খুবই স্বাভাবিক। কারণ এমন গণহারে পাগড়ি প্রদানের জন্যে এ মাহফিলের আয়োজন করা হয়নি। তাছাড়া এত অধিক পরিমাণে পাগড়ি আগে থেকে প্রস্তুতও করা হয়নি।

কিন্তু এতসব যুক্তি থাকা সত্ত্বেও মাওলানা এতগুলো মানুষের মন ভাঙ্গতে চাইলেন না। তিনি বললেন, ঠিক আছে, আপনাদের সবাইকে পাগড়ি দেয়া হবে।

মাহফিল কর্তৃপক্ষ হায় হায় করে উঠলো। কী উপায় হবে এখন? এতো পাগড়ি এক সাথে কোথায় পাওয়া যাবে?

এদিকে মাওলানা তার কার্যক্রম শুরু করে দিলেন। বললেন, আপনারা সবাই নিজ নিজ টুপি খুলে হাতে নিন। নিয়েছেন? ঠিক আছে, এবার সবাই নিজ নিজ টুপি আবার মাথায় পরিধান করুন। পরিধান করেছেন? এই তো হয়ে গেল পাগড়ি প্রদান। আমার পক্ষ থেকে আপনারা সবাই পাগড়ি পেয়ে গেলেন।

মাহফিল জুড়ে হাসির রোল বয়ে গেলো।

গল্পের তোহফা:

এ হাসি কোনো তামাশার হাসি ছিলো না। বরং এটি ছিলো প্রাপ্তি আর আনন্দের নির্মল হাসি।

খোরাসানের উট

মাওলানা আব্দুল্লাহ দরখাস্তী সাহেবের বয়ানের আরেকটি মজার বিষয় ছিলো, তাঁর বয়ান চলাকালে কেউ দাঁড়িয়ে গেলে তিনি বলতেন,

خراسان کا اونٹ! تو بھی کھڑا ہو گیا؟

'খোরাসানের উট, তুমিও দাঁড়িয়ে গেছো?'

উল্লেখ্য, উটের মধ্যে অস্থিরতা খুব বেশি। বসিয়ে রাখলে উঠে পড়তে চায়। বেঁধে রাখলেও যে কোন উপায়ে ভেগে যেতে চায়। এসব উটের মধ্যে আবার খোরাসানের উট পৃথিবীখ্যাত।

দ্বীনী মাহফিলগুলোতেও অনেক সময় দেখা যায় কিছু মানুষ কোন প্রয়োজন ছাড়াই ওঠাউঠি করতে থাকে। তাদের দেখে মনে হয় উটের মতো অস্থির। দীনী কথা শুনতে ভালো লাগছে না।

এ ধরনের লোকদেরকেই আব্দুল্লাহ দরখাস্তী সাহেব 'খোরাসানী উট' বলে সম্বোধন করতেন। তবে এদের মধ্যে কারো সত্যিকারের ওযরও থাকতে পারে। সেজন্যে পরক্ষণেই হাস্যরস মিলিয়ে বলতেন,

شاید مولوی صاحب کو پیشاب لگ گیا، سب کہو سبحان اللہ۔

'মনে হয় মৌলবি সাবের ইস্তেঞ্জা চেপেছে, সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ'।

গল্পের তোহফা:

বড়দের রসিকতার মধ্যেও লুকিয়ে থাকে নসীহতের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার।

সমুদ্র হৃদয়

হাজী আব্দুল মালেক রহ.। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। সম্পদের পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা তাকে আরো অনেক নিয়ামত দান করেছিলেন। কুরআন ও মাদারেসে দীনিয়্যার খেদমতে তার মতো অগ্রসরমান ব্যক্তি খুব কমই পাওয়া যায়। জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া ও বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুরআনের মতো প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি জড়িয়ে ছিলেন আজীবন। সবসময় পড়ে থাকতেন উলামায়ে কেরামের সোহবতে।

ঘটনাটা তার এক আত্মীয়ের। তিনিও ছিলেন বুযুর্গদের সোহবতপ্রাপ্ত। তিনি যখন কাঁচা বাজারে যেতেন, একেবারে বেলা শেষ করে যেতেন।

কাঁচা বাজারে সাধারণত সবাই সকাল সকাল যায়। এই সময় মাছ সবজি সবকিছু থাকে টাটকা। কিন্তু তিনি বাজারে যেতেন সন্ধ্যার পর। তারপর বেছে বেছে কিনে আনতেন পঁচা মাছ আর সবজি।

কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, এরা তো এই সব পঁচা মাছ আর সবজি নিজেদের কষ্টের পুঁজি খরচ করেই কিনেছে। এখন দিন শেষে এগুলো কেউ কিনতে চাইছে না। ফলে লাভ করা তো দূরের কথা, এরা পুঁজিই হারাতে বসেছে। আমাকে তো আল্লাহ তা'আলা সঙ্গতি দিয়েছেন। আমি যদি স্বাদের চিন্তা বাদ দিয়ে এগুলো কিনে ফেলি তাহলে এদের কত বড় উপকারটাই না হবে!

মহৎপ্রাণ এই ব্যক্তি যখন দু'হাতের ব্যাগ ভর্তি করে এসব পঁচা মাছ কিনে বাসায় ফিরতেন, তার স্ত্রী তখন সারাদিনের কাজকর্মের ধকলে ক্লান্ত শ্রান্ত। হয়ত সবেমাত্র বিছানায় গা'টা এলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনিও কম নন। তার স্বামী একাই সব সওয়াব নিয়ে নেবেন

তা কি হয়? তাই তিনিও আরাম বিশ্রাম বাদ দিয়ে লেগে যেতেন মাছ কুটার কাজে। ...

গল্পের তোহফা:

অন্যের জন্যে নিজের সুখকে বিসর্জন দেয়া খুব সহজ কাজ নয়। এর জন্যে সমুদ্রের মতো একটা হৃদয়ের প্রয়োজন হয়।

বিনয়ের বৃষ্টি

মিসর। অসংখ্য ওলীর দেশ। উলামায়ে কেরামের দেশ। একবার মিসরে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হলো। বৃষ্টিও বন্ধ অনেকদিন ধরে।

শহরের লোকেরা বৃষ্টির জন্যে অনেক দু'আ করলো। কিন্তু লাভ হলো না। অবশেষে তারা এলো সে সময়ের সবচেয়ে বড় বুযুর্গ যুন্নুন মিসরী রহ. -এর কাছে। বললো, হুযুর, আপনি আমাদের জন্যে দু'আ করেন। আল্লাহ যেন আমাদের বৃষ্টি দান করেন। এই দুর্ভিক্ষ থেকে আমাদের উদ্ধার করেন।

যুন্নুন মিসরী উত্তর দিলেন, ইনশাআল্লাহ আমি দু'আ করবো। কিন্তু আরেকটা কথা শোন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'দুনিয়াতে তোমাদের ওপর যে দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ আসে তা তোমাদের পাপের কারণেই আসে, (সূরা রূম: ৪১)।' এই যে এখন বৃষ্টি হচ্ছে না। এর মানে আমরাও পাপে লিপ্ত আছি। এর ফলে আল্লাহ বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছেন।

এজন্যে সর্বপ্রথম আমাদের একটা কাজ করতে হবে। এ শহরের সবচেয়ে বড় পাপী যে তাকে শহর থেকে বের হয়ে যেতে হবে।

লোকেরা হযরত যুন্নুন মিসরী রহ. এর কথা শুনে একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে শুরু করলো। শহরের সবচেয়ে বড় পাপীকে শনাক্ত করা! এটা তো বলতে গেলে অসম্ভব।

হযরত যুন্নুন মিসরী বললেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমার মনে হয় আমিই সবচেয়ে বড় পাপী। আমি শহর থেকে বের হয়ে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ, এরপরই এখানে বৃষ্টি হবে।

লোকেরা হায় হায় করে উঠলো। শহরের সবচেয়ে বড় বুযুর্গ নিজেকে সবচেয়ে বড় পাপী দাবী করছেন। বের হয়ে যাচ্ছেন শহর থেকে। কী উপায় হবে?

রাতের আঁধার ঘনিয়ে এলো। হযরত যুন্নুন মিসরী চাদর মুড়ি দিয়ে মিসর ত্যাগ করলেন।

সে রাতেই মিসরে প্রচুর বৃষ্টি হলো।

গল্পের তোহফা:

এ বৃষ্টি হযরত যুন্নুন মিসরী রহ. এর শহর ত্যাগের কারণে হয়নি, হয়েছে তাঁর বিনয়ের কারণে।

গ্রন্থপঞ্জি

- আল কুরআনুল কারীম।
- তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম: দারুল ফিকর, দামেশক, সিরিয়া।
- তাফসীরে ইবনে কাসীর: দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর।
- তাফসীরে মাযহারী: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
- তাফসীরে রুহুল মা'আনী: দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত।
- মা'আরিফুল কুরআন: ইদারাতুল মা'আরিফ, করাচী, পাকিস্তান।
- সহীহ বুখারী, দারু ইবনি হাযম, কায়রো, মিশর।
- সহীহ ইবনে হিব্বান: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন।
- সুনানে তিরমিযী: দারু ইবনি হাযম, বৈরুত, লেবানন।
- সুনানে আবু দাউদ: মুআস্সাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত, লেবানন।

- দালায়েলুন নবুওয়াহ: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
- আস সীরাতুন্নাবাবিয়্যাহ লিবনি হিশাম: দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত।
- আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
- উসদুল গাবাহ: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন।
- তারীখে দিমাশক: দারুল ফিকর বৈরুত, লেবানন।
- আল কানযুল মুতাওয়ারী: মুআস্সাসাতুল খলীল আল ইসলামিয়্যা, পাকিস্তান।
- শরহুল আল্লামা আযযুরকানী: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
- কাশফুল বারী: দারুল কিতাব, দেওবন্দ।
- ইসলামের সৌন্দর্য: মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.), মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা।
- কেলীদে মসনবী: আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া।
- ইসলামী যিন্দেগী: মুফতী মনসূরুল হক (দা. বা.), মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা।